বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি

শ্রীমতীকল্যাণী কার্লেকার

মিত্রবিহার লিমিটেড
৫ শঙ্কর ঘোষ লেন • কলিকাতা ৬

বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বি-টি পরিক্ষার্থীদের
পাঠ্যরূপে অনুমোদিত

শ্রীমতী কল্যাণী কার্লেকর, এম্-এ, বি-টি

স্কটিশ চার্চ কলেজের বি-টি বিভাগের লেকচারার

মিত্রবিহার লিমিটেড

৫ শঙ্কর ঘোষ লেন • কলিকাতা ৬

তৃতীয় সংস্করণ— আশ্বিন ১৩৬২
দাম আড়াই টাকা

প্রকাশিকা শ্রীমতী মায়া মিত্র
মিত্রবিহার লিমিটেড । ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন । কলিকাতা ৬

মুদ্রক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ
বোধি প্রেস । ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন । কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

দাদামশাই ৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর "সন্দেশ"-এর ভাণ্ডার থেকে রসসঞ্চয় করে, বাংলা ভাষার উপর কিঞ্চিৎ অধিকার ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুরাগ জন্মেছিল ; তাঁর 'ছেলেদের রামায়ণ' ও 'মহাভারতের' নানা কাহিনী পড়ে অতীতের গৌরবময় অধ্যায়গুলি প্রথম চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। শিশুকালের সেই অপরিশোধনীয় স্নেহঋণের স্মরণে এই সামান্য শ্রদ্ধাঞ্জলি উৎসর্গীকৃত হ'ল।

ভূমিকা

বিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকেরও যে শিক্ষা-অর্জ্জনের বিশেষ প্রয়োজন আছে, একথা এদেশে পূর্ব্বে কেহ মনে করিতে পারিতেন কি না, সন্দেহের বিষয়। এখনও যে সকলে ইহার উপযোগিতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, এমন মনে হয় না। কারণ, বাঙ্গালী ছেলে-মেয়েদের পক্ষে বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা করা এখনও একশ্রেণীর লোকের নিকট বাহুল্যরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহাদের মনোভাব এই যে, যেহেতু বাঙ্গালা আমাদের মাতৃভাষা, সেহেতু নূতন করিয়া উহা শিখিবার আর আবশ্যকতা কি? তবে সুখের বিষয়, এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। অধিকন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে বাঙ্গলাভাষার মর্য্যাদা-বৃদ্ধি ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাঙ্গালাভাষার জন্য পূরা দুইশত নম্বরের পাঠ্যপ্রবর্ত্তনের ফলে বাঙ্গালাশিক্ষার দিকে এখন অনেকেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। যিনি যাহাই বলুন, অন্ততঃ পরীক্ষার্থিগণ এখন আর বাঙ্গালাশিক্ষার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিতে পারে না।

বাঙ্গালাভাষা আমাদের মাতৃভাষা বলিয়া যাঁহারা বাঙ্গালাশিক্ষা অনাবশ্যক মনে করেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, ইংরেজ বালকবালিকা দিগকেও বিদ্যালয়ে ইংরেজীভাষা শিক্ষা করিতে হয়। ইংরেজীভাষার শিক্ষাপদ্ধতি-সম্বন্ধে বিলাতে যে রাশি রাশি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ইংরেজ ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যেই লিখিত, এবং তাহাতেই প্রমাণিত হয় যে ইংরেজ শিক্ষাবিদ্গণ মনে করেন না যে তাঁহাদের

ছেলে-মেয়েদের ইংরেজী-শিক্ষার কোনও প্রয়োজন নাই। শুধু বিলাতে কেন, ইউরোপের অন্যান্য দেশের এবং মার্কিন অঞ্চলেও মাতৃভাষা-শিক্ষার জন্য নব নব বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী নিত্যই উদ্ভাবিত হইতেছে।

ভাষাশিক্ষা-সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ যে সকল গবেষণামূলক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার অনেকাংশই বাঙ্গালাশিক্ষা-বিষয়েও প্রয়োগ করা যায়। ভাষাশিক্ষার মূল তত্ত্বগুলি সর্ব্বত্রই প্রায় সমান। তবে ইহাও স্বীকার্য্য যে, বাঙ্গালাভাষাশিক্ষারও নিজস্ব কতকগুলি সমস্যা আছে —প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। আনন্দের বিষয়, শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী কল্যাণী সেনের এই পুস্তকে উক্ত দুই দিকই আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার লেখা শুধু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপ্রণালীগুলির পুনরাবৃত্তি নহে, তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তিও বটে। সুতরাং বাঙ্গালার শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণ এই গ্রন্থ হইতে অনেক প্রকার শিখিবার ও ভাবিবার বস্তু পাইবেন, এইরূপ আশা করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে L. T. ও B. T. Course-এ বাঙ্গালা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি পাঠ্যবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে সুলিখিত গ্রন্থের একান্ত অভাব। বর্ত্তমান গ্রন্থকর্ত্রী এই অভাব-মোচনে যত্নবতী হইয়া বাঙ্গালীমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই অনতিবৃহৎ অথচ মূল্যবান্ পুস্তকখানি এ বিষয়ে পথ-প্রদর্শক হইয়া বাঙ্গালার শিক্ষাবিদ্‌গণকে সচেতন করিয়া তুলিলে শিক্ষায়তনে সত্যসত্যই নবযুগের সঞ্চার হইবে।

১০ই শ্রাবণ,
১৩৫০

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থকর্ত্রীর নিবেদন

বাংলাশিক্ষাপদ্ধতির অধ্যাপনা করতে আরম্ভ করবার সময়ে পুস্তকরচনার কল্পনা মনে ছিল না ; কিন্তু কাজে অবতীর্ণ হয়ে অত্যন্ত দুঃখের সংগে আবিষ্কার করলাম যে এতদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন বই প্রকাশিত হয়নি।

ইংরেজিতে লেখা "ভার্ণাকুলার" শেখাবার বই এবং ইংরেজের মাতৃভাষার শিক্ষাপুস্তক অবলম্বন করে ছাত্রীদের জন্য "নোট" তৈার করতে বসলাম। দেখতে পেলাম, সমস্ত উদাহরণ বিদেশী, সকল পদ্ধতি বিজাতীয়। সেগুলিকে বাংলাভাষায় প্রযোজ্য করতে হ'লে যতটুকু পরীক্ষা ও ব্যবহারের ভিত্তির প্রয়োজন তার একান্ত অভাবই লেখিকাকে এই দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত ক'রল। ছাত্রজীবনের স্মৃতি এবং অধ্যাপক ও পরীক্ষকজীবনের অভিজ্ঞতার রঙে রঞ্জিত করে বিদেশী রীতিগুলিকে বাঙালী করতে উদ্যত হলাম ; মাঝে মাঝে স্বাধীন চিন্তার স্পর্ধাও করেছি, কাজে কতদূর সফল হয়েছি জানি না।

বাংলাভাষাশিক্ষার প্রসারকল্পে অক্লান্তকর্মা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সামান্য গ্রন্থের মুখপত্র লিখে দিয়ে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এর প্রকাশের ব্যবস্থা করে' যে উপকার করেছেন, তার জন্য তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। তাঁর সহায়তা না পেলে অখ্যাতনাম্নী গ্রন্থকর্ত্রীর পক্ষে এই গুরুভার বহন করা সম্ভব হইত না।

বাংলাশিক্ষাপদ্ধতির আলোচনায় শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু একজন পথ-প্রদর্শক। তিনি অত্যন্ত অসুস্থতাসত্ত্বেও বইখানির পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত সংশোধন করে দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। অনেক তর্ক করেছি, বহু অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছি, কিন্তু তাঁর ধৈর্য বিচলিত হয়নি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় এ কাজে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং তৎরচিত "বাংলা পড়ানো" বইখানা থেকে সাহায্য পেয়েছি বলে তাঁকেও স্মরণ করছি।

আমার জ্ঞাত অজ্ঞাত আরো অনেকে এই বইয়ের সঙ্গে কর্মসূত্রে জড়িত হয়েছেন; তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তৃতীয় সংস্করণ

"বাংলাভাষার শিক্ষাপদ্ধতি"র দ্বিতীয় সংস্করণে বিশেষ কিছু পরিবর্তন করা হয়নি; কিন্তু গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগাদর্শের যে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তার সংগে সামঞ্জস্য রাখার জন্য এই তৃতীয় সংস্করণ বহুলভাবে পরিবর্তিত ও কিঞ্চিৎ পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হ'ল। প্রায় বারো বছর আগে এই গ্রন্থে যে সব আদর্শের ছায়াপাত মাত্র করা হয়েছিল তার অধিকাংশই আজ সরকারি শিক্ষাদর্শের অংগীভূত। তৃতীয় সংস্করণে ওই ছায়াকে কায়ারূপ দেওয়ার কাজ শ্রমসাপেক্ষ হ'লেও তাতে আনন্দলাভ করেছি। আশাকরি জাতীয় শিক্ষার অভ্যুদয়ের যুগে এই সামান্য অঞ্জলি ব্যর্থ হবে না।

সূচী

মাতৃভাষা-শিক্ষার উদ্দেশ্য

যে-কোনো ভাষাই শিক্ষা দেওয়া হোক না কেন, তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য সেই ভাষাটি ব্যবহার করবার ক্ষমতালাভ। বাঙালী যখন ইংরেজি বা হিন্দীভাষা শেখে তখন তার এই প্রয়োজনের দিকটা মুখ্য হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি ইত্যাদির জন্য ইংরেজির জ্ঞান এখনও আমাদের পক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয়। তাছাড়া আন্তর্জাতিক ভাষারূপে এর একটা স্থায়ী মূল্যও আছে। হিন্দীভাষা নানাকারণে বহুদিন হ'তে ভারতের অনেক স্থলে ব্যবহৃত হ'ত। বর্তমানে রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হওয়ায় বাধ্য হয়ে সকলে শিখবেন।

ভাষাশিক্ষার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাহিত্যরসের উপভোগ। মানুষ অন্তরে অন্তরে শিল্পী, সে যে-কোনো একটা ভাষা শিখে সেটাকে ব্যবহার করে' ক্ষান্ত হয় না, সাহিত্যপাঠের আনন্দ উপভোগ করতে চায়। ভারতবাসী ইংরেজি শেখে সরকারি তাগিদে, কিন্তু ভাষার ব্যবহার আয়ত্ত করবার পর কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতির পাঠ, আলোচনা করে' ও নানা জ্ঞানবিজ্ঞানের বই পড়ে' পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করে। হিন্দীভাষার সাহিত্যসমৃদ্ধি এখনও তত পরিণত হয়নি বলে' তার সম্বন্ধে এই সত্য সহজে উদ্ঘাটিত হয় না বটে তবু বলা যায় যে যে-কোনো-ভাষারই এমন একটি মোহিনী শক্তি আছে যার বলে তার রস তার কাজের ব্যাপারটিকে ছাপিয়ে ওঠে।

ভাষাশিক্ষার সাধারণ প্রয়োজনের ওপরে মাতৃভাষার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। এইভাষা শুধু কাজ করে না, শুধু আনন্দ দেয় না, আমাদের

সমস্ত জীবনকে গড়ে' তোলে আর ঘিরে রাখে। মানবসত্তার প্রথম বিকাশ যে আত্মপ্রকাশ তা মাতৃভাষার সাহায্যেই হয়। শিশু যখন প্রথম কলধ্বনি করে, যখন প্রথম তার মাকে মা বলে' ডাকে, তখন সেটা তার কাজের কথা নয়, তার চেতনার বিকাশ, তার প্রথম আত্মবোধ। মানুষের প্রথম আত্মপ্রকাশের বিরাট গৌরব তার 'মা' ডাকে মাকে অবলম্বন করে' জেগে ওঠে। এই আত্মপ্রকাশ অন্নবস্ত্রের চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়।

আত্মপ্রকাশ ও ভাবের আদানপ্রদানের ওপর মানুষের চেতনা প্রতিষ্ঠিত। মানুষ অতিরিক্ত একা থাকলে তার মানসিক বিকৃতি জন্মানো সম্ভব এবং যে পূর্ণভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেনা তার পক্ষে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশলাভ কঠিন। মাতৃভাষা এই আত্মিক বিকাশের বাহন। যে বাঙালী নিজের ভাষায় ভাল করে' আত্মপ্রকাশ করতে শেখেনা, সে শুধু বাঙালী নয়, পুরো মানুষ হ'তে পারেনা। এই দিকটায় শৈথিল্যের জন্যই হয়তো বাঙালী ভাল চাক্‌রে হচ্ছে, ডাক্তার, উকিল, ব্যারিষ্টার হচ্ছে, কিন্তু জাতিহিসেবে পূর্ণতার পরিচয় দিতে পারছে না।

মাতৃভাষার প্রতি অবহেলার প্রত্যবায় গভীর ও ব্যাপক। শিশুর সমস্ত সত্তা, আশা, আকাংক্ষা ও স্বপ্ন মাতৃভাষাকে অবলম্বন করে' রূপ নেয়; এই বিরাট মহীরুহের অংকুরকে যদি সযত্নে বাঁচিয়ে রাখা না যায় তবে মানুষটিকে বিকৃত করা হয়। আমাদের দেশের একশ্রেণীর লোকের মধ্যে এখনও এমন একটি প্রথা প্রচলিত আছে যারদ্বারা শিশুকে তার মাতৃভাষার পরিপূর্ণতা থেকে বঞ্চিত করে' ভাঙা হিন্দী বা ফিরিংগি ইংরেজি অবলম্বন করতে শেখান হয়। এদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষাসমস্যা' প্রবন্ধে বলেছেন—"বাপ-মা বহু অপব্যয়ে, বহু অপচেষ্টায় সন্তানদিগকে সকল সমাজের বাহির করিয়া দিয়া স্বদেশে অযোগ্য ও বিদেশে অগ্রাহ্য করিয়া তুলিতেছে * * * * ভবিষ্যত দুর্গতির জন্য বিধিমতে প্রস্তুত করিতেছে।"

বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থার আংশিক সংস্করণের ফলে এই অবস্থার কিঞ্চিৎ অপনোদন হ'লেও মাতৃভাষার শিক্ষা স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ইংরেজি-বাংলার টানাটানিতে আজকের ছাত্রছাত্রীরা উভয় কূলেই ভ্রষ্ট হচ্ছে। পরীক্ষাপত্র-পরীক্ষণের অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁরা জানেন যে ইংরেজি জ্ঞানের মানের অবনতির সংগে বাংলাজ্ঞানের মানোন্নয়ন তো হয়ইনি, বরং সাধারণ একটি ভাষাগত দুর্বলতা ও প্রকাশের অক্ষমতা ছাত্রসমাজের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে।

হয়তো বর্তমান অবস্থা সন্ধিক্ষণজাত এক অস্থায়ী বিকল্পমাত্র, হয়তো নূতন-পুরাতনের সামঞ্জস্যসাধনের সংগে মাতৃভাষা তার সন্তানের হৃদয়কে অধিকার করে' শক্তিশালী করতে সমর্থ হবে, কিন্তু সেই পরিণতির উদ্দেশ্যে বিবিধ উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন।

অব্যবহিত অতীতের ভাষাবিভ্রাটের স্মৃতি থেকে এখনও অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংগে প্রথম সংঘর্ষের সময়ে বাঙালীরা য়ুরোপের বহির্বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করে' পৃথিবীর অগ্রগামী জাতিসমূহের সমান হবার আশায় ইংরেজি শিক্ষাকে সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছিল, কিন্তু বিশাল্যকরণীর সংগে গন্ধমাদনের মতো পাশ্চাত্য বিদ্যার সংগে তার বাহনটিকেও আত্মসাৎ করার চেষ্টায় ভ্রান্তি ঘটেছিল। ইংরেজি শিক্ষায় দেশের লাভই হয়েছিল। কিন্তু ভুল হয়েছিল তাকে মাতৃভাষার আসনে প্রতিষ্ঠিত করায়।

শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষার ব্যবহার না হওয়ার ফলে মাতৃভাষার শিক্ষাও অংগহীন হয়েছে। মাতৃভাষায় কেবল সাহিত্যালোচনা হয়েছে, রসোপলব্ধি হয়েছে, জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা হয়নি, চরিত্রগঠনোপযোগী মালমসলার চয়ন হয়নি। বাঙালী কবিতা-নাটক-উপন্যাস লিখেছে, কিন্তু সর্বশাখায় সম্পূর্ণ জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেনি। আন্দোলন করেছে,

আত্মত্যাগ করেছে কিন্তু কঠিন গঠনমূলক কাজের লোক হ'তে পারেনি। জাতীয় সাহিত্য যে জাতিগঠনে কতটা কার্যকর, বাঙালীর ইতিহাসে নিষেধমুখে তার প্রমাণ হয়েছে।

বাঙালী মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চা করেনি বলে' আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আক্ষেপ করেছেন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলে' গেছেন যে শুধু গল্প ও কবিতা-গুচ্ছে পূর্ণাংগ জাতীয় সাহিত্য হয় না।

মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করার দ্বিতীয় বিপদ বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবনে ঘটছিল। পরের ভাষায় সব জ্ঞান অর্জন করার ফলে বাঙালী সেই জ্ঞান আত্মনীন করে' নিতে পারেনি। গ্রহণ ও প্রকাশের স্বাভাবিক যন্ত্র মাতৃভাষার সংগে সংযোগহীন বিদ্যা দাসত্বের মার্কা হয়েছে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেনি। শিক্ষার পরিপাকের এই অভাবের প্রতি লক্ষ্য করে' রবীন্দ্রনাথ তাঁর "শিক্ষার হেরফের" প্রবন্ধে বলেছেন— "আমরা যে শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি সে শিক্ষা কেবল যে আমাদিগকে কেরানিগিরি অথবা অন্য কোন একটি ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র। যে সিন্দুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি সেই সিন্দুকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই, আটপৌরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোন ব্যবহার নাই ইহা বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী গুণে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। * * * * * অসম্পূর্ণ জীবন ও অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া বাঙালীর সংসারযাত্রা দুইই সঙের প্রহসন হইয়া দাঁড়ায়।"—শিক্ষাপদ্ধতির এই ভুল একদিকে বহু অবজ্ঞাত 'বাবু' শ্রেণীর ও অপরদিকে পরগাছা 'ইংগবংগ' সমাজের পরিপোষক।

পরভাষায় শিক্ষাব্যবস্থার তৃতীয় বিপদ এই যে তাতে দেশের জনসাধারণ অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত থেকে যায়। যেমন একটি মানুষের মধ্যে দুটি মানুষ, তেমনি এক জাতির ভেতর দুটি জাতি যেন পরস্পরের সংগে

সংগ্রাম করতে চায়। আমাদের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজের যে বিরাট ব্যবধান এমন বোধ হয় পৃথিবীর কোনো উন্নত দেশে নেই। বিজাতীয় শিক্ষা এর মূলীভূত কারণ; এর জন্য শিক্ষিত বাঙালী অশিক্ষিত ইংরেজের সংগে দৃষ্টিভংগীর মিল পেতে পারে, কিন্তু অশিক্ষিত বাঙালীর সংগে তার যোগ নেই।

উনবিংশ শতাব্দীতে বংকিমচন্দ্র বুঝেছিলেন, যে-কথা বাংলায় কথিত না হবে সে-কথা আপামর সাধারণের অনধিগম্য থেকে যাবে; তাই তিনি বংগদর্শনকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সামঞ্জস্যসাধনের দূতরূপে বাংলার প্রতি ঘরে পাঠাবার ব্রত নিয়েছিলেন। কিন্তু পরিপূর্ণ জাতিগঠনের জন্য স্বাংগীকরণের প্রয়োজন—দৌত্যযোগমাত্র যথেষ্ট নয়।

প্রথমে বাংলার বাঘ আশুতোষের উদ্যোগে ও তৎপুত্র শ্যামাপ্রসাদের উদ্যমে বাংলার দুর্দশামোচনের পথ উন্মুক্ত হয়। তারপর প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হবার ফলে ভবিষ্যতের আশা বর্ধিত হয়েছে।

বাংলাভাষা শিক্ষার বাহনরূপে গৃহীত হবার পর থেকেই মানুষ তৈরি করার ভার মাতৃভাষার শিক্ষকের হাতে ন্যস্ত হয়েছিল। স্বাধীন ভারতে সেই কর্তব্য গুরুতর ও তার পালনের সুযোগ অধিকতর হয়েছে।

এই দায়িত্ব মাতৃভাষার শিক্ষককে সজ্ঞানে তুলে নিতে হবে। তাঁকে শিশুর অংকুরকে মহামহীরুহে পরিণত করতে হবে। মাতৃভাষার বাহনে শিক্ষা ও সরস আনন্দময় হয়ে উঠবে, ভাষার ব্যাবহারিক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে কর্মজীবনের কঠিন মেরুদণ্ড গঠিত হবে, সাহিত্যালোচনা ও রসানুভূতির দ্বারা ব্যক্তিত্ববিকাশ সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে।

সম্ভাবনা অনেক, কিন্তু তাকে সফল করে' তুলতে হ'লে চাই সুশিক্ষক প্রযুক্ত সুপদ্ধতি, কেবল ইংরেজিভাষার স্থানে মাতৃভাষাকে স্থাপিত করলে মন্ত্রের সাধন হবেনা—সমগ্র ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই।

শিক্ষাকালের স্তরবিভাগ

বয়স ও পরিণতির দিক দিয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মোটামুটি তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের তিনটি ধাপ মোটামুটি এই তিন স্তরের অনুসারী।

এক

শিক্ষাকালের প্রথম স্তরে প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার শ্রেণীগুলিকে ধরা যায়, অর্থাৎ শিশুশ্রেণী থেকে আরম্ভ করে' চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত। বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনের পর সম্ভবত পঞ্চম শ্রেণীও প্রাথমিক ব্যবস্থার অন্তর্গত হবে। এই কয় বৎসরে ছাত্র তার শৈশব এবং বাল্যের কিয়দংশ অতিবাহিত করে।

শিশু যখন প্রথম বিদ্যালয়ে আসে তখন সে প্রায় কিছুই জানেনা, তাকে বিশুদ্ধভাবে কথা বলতে পর্যন্ত শেখাতে হয়। আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রকাশ সব শিক্ষার মূল, তাই সাধারণ কথাবার্তা ও খেলাধুলার মধ্য দিয়ে শিশুর এই বোধ জাগ্রত করতে হয়। শিক্ষকের সংগে নানা পরিচিত বিষয়ে কথা বলে' শুধু যে শিশুর ভাষার ব্যবহারক্ষমতা বৃদ্ধি পায় তা নয়, তাতে তার ভয় ভাঙে; তাছাড়া শিক্ষাপদ্ধতির যে দোষের জন্য ঘর ও বিদ্যালয়, জীবন ও বিদ্যা, সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়, সেই দোষ দূর হ'তে পারে। স্বভাবতই এই দায়িত্বের প্রধান অংশ মাতৃভাষার শিক্ষককে গ্রহণ করতে হয়।

ভাষার ওপর কিছুটা অধিকার হ'লে শিশু লেখাপড়া শেখে। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিসমূহের সাহায্যে আজকের শিশু "অ-আ-ক-খ"

মুখস্থ না করে' আনন্দের মধ্যে শিক্ষা লাভ করে। এতে ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্যসাধনের অসুবিধা হ'লে তার অতিক্রমের উপায় আছে। লিপির প্রতীকদ্যোতকতার তত্ত্ব শিশুর বোধগম্য না হ'লেও তার স্বভাবের চিত্রধর্ম এত প্রবল যে লিপি যে ভাব ও বস্তুবাচক শব্দের ছবি এ-কথা তাকে বোঝানো আয়াসসাধ্য নয়। তা-ছাড়া মানবজাতির বহুযুগের লেখাপড়ার অভ্যাসের ফলে আধুনিক-কালের শিশু সহজে পড়তে ও লিখতে শেখে।

এ সময়কার শিক্ষার মূল প্রধানত আনন্দ। আনন্দের ওপর যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত তাতে শিশুর সম্পূর্ণ মনোযোগ পাওয়া যায় এবং পড়ার প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ জন্মানর ফলে তার বৃত্তিসমূহের পূর্ণ-পরিণতি সহজলভ্য হয়। এইজন্য শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হবে খেলার মধ্য দিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ সফল কার্যকলাপ ও সানন্দ সাহিত্যসাধনায় উত্তীর্ণ হবে।

সাহিত্যরসের উপলব্ধিও অল্প বয়সেই সম্ভব। শিশুর সাহিত্যবোধ তার আদিম জীবনসম্ভোগের আনন্দজাত, তারই ওপর পূর্ণমানবতার ভিত্তি। এই বয়সের সজীবতা ও সরসতাকে পুষ্ট করতে না পারলে সে সুযোগ হয়তো আর পাওয়া যাবে না। শিশুমনের প্রত্যেক বৃত্তির বিকাশের নির্দিষ্ট সময় আছে, তা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে সেই বৃত্তি চিরনিরুদ্ধ থেকে যেতে পারে। রসবোধের সম্বন্ধেও সে-কথা সত্য ; তাই খেলা, গান, ছবি ও ছড়ার মধ্য দিয়ে শিশুর সৌন্দর্য ও আনন্দের স্পৃহার চরিতার্থতা সাধন করে' তার বুদ্ধি, জিজ্ঞাসা ও সাধনাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

দুই

বিদ্যালয়ের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্গত বলে' ধরে' নেওয়া যায়। এই বয়সের ছাত্রদের শিক্ষকতার কাজ সবচেয়ে কষ্টসাধ্য।

এই স্তরে বালক বাল্য অতিক্রম করে' কৈশোরে পদার্পণ করে বলে' একে বয়ঃসন্ধিকাল বলে' অভিহিত করা যায়। জীবনের এক অবস্থা-সংকটরূপে এই সময়ে ছাত্রছাত্রীর ব্যবহারে হিষ্টিরিয়া, অযথা চাঞ্চল্য প্রভৃতি বিপর্যয় দেখা যেতে পারে, এমন কি মানসিক ব্যাধিও হ'তে দেখা গিয়েছে। অথচ এইটিই আবার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সময় এবং এরই সঠিক পরিচালনের ওপর ছাত্রের ভবিষ্যৎ বহুলাংশে নির্ভর করে। এই সময়ে তার মনের যে মোড় দেওয়া যায় তদনুযায়ী তার মনুষ্যত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়। কাজেই এই সময়ে শিক্ষকের দায়িত্ব খুব বেশি।

বয়ঃসন্ধির সংকট এড়ানো কঠিন নয়। এই সময়ের চাঞ্চল্যের মুখ্য কারণ এই যে বালকবালিকার পরিণতিশীল শরীরমনের কতকগুলি পরিবর্তনের ক্রমানুসারে তাদের দৃষ্টিভংগী পরিবর্তিত হ'তে থাকে এবং জগতের সংগে নূতন করে' বোঝাপড়া করার প্রয়োজন হয়। এইজন্য এই সময়ে তাদের যতদূর আনন্দপূর্ণ, কর্মব্যস্ত ও আগ্রহজনক পরিস্থিতির মধ্যে রাখা যায় তাদের চিত্তবিক্ষেপের সম্ভাবনাও তত কম হয়।

অনেক সময়ে শারীরিক ও মানসিক পরিণতির অসামঞ্জস্যের ফলে সংকটের সৃষ্টি হয়। এই বয়সে যে-সব অস্বাভাবিক বালকবালিকা (problem children) দেখা যায় তাদের অনেকেরই ব্যতিরেকের কারণ এই অসামঞ্জস্য। দেহ যখন পরিণতির দিকে অগ্রসর হয় তখন মনের খোরাক উপযুক্ত পরিমাণে না জুটলে অলস মনে নানাপ্রকার চিন্তার উদয় হয়, যে সকল আদিম প্রবৃত্তির উদ্গতি ভিন্ন মনুষ্যপদবাচ্য হওয়া দুষ্কর সেগুলি বর্ধিত হবার সুযোগ পায়, অতিসচেতন মন কু-অভ্যাসের বশবর্তী হয়। এই বয়সের ছাত্রদের আত্মসচেতনতার ওই হানিকর অতিরেক থেকে বাঁচাতে হ'লে তাদের নানাদিকে, নানাকাজে পরিপূর্ণভাবে নিবিষ্ট করতে হবে।

তাই এই স্তরে কেবল আত্মলাভ ও আত্মপ্রকাশের চেষ্টাই যথেষ্ট নয়, এখন বালকবালিকার পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশের পথ খুঁজতে হবে। এই সময়কার সাহিত্যশিক্ষা ভাষার ব্যবহার শিক্ষার ওপরকার স্তরের, সচেতনভাবে সৌন্দর্যানুভূতি ও সৃষ্টির সাধনা, তাই পরিপূর্ণতর সাহিত্যের প্রয়োজন। বালক-কিশোর বহির্জগতের সংগে অনেকাংশে পরিচিত হয়েছে এখন বৃহত্তর বিমূর্তভাবজগতের সংগে পরিচয় সুরু হবে, অনুভবের আনন্দের সংগে আলোচনার আনন্দ মিলিয়ে দিতে হবে, পাঠ্যপাঠ ও সাহিত্যচর্চা পাশাপাশি চলবে।

এই স্তরে শিক্ষক ছাত্রকে দিয়ে কাজ করাবেন। আগের স্তরের শিক্ষার ভিত্তি খেলার থেকে কাজের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এখনকার শিক্ষা প্রবুদ্ধ সাহিত্যানুরাগের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার প্রেরণার জন্য পাঠ্যবস্তুকে চিত্তাকর্ষক করবার অন্য প্রকারের উপায়সমূহ অবলম্বন করতে হবে। খেলার প্রয়োজন যে শেষ হয়েছে তা নয়, কিন্তু এতদিনে ছাত্রছাত্রীর মনে সাহিত্যানুরাগ এতটা উদ্রিক্ত হয়ে গিয়ে থাকা উচিত যাতে আপনি তার সাহিত্যসাধনার চেষ্টা আসে। এখনকার ছাত্রকে সূক্ষ্মানুভূতির দৃঢ়সূত্র দিয়ে লেখাপড়ার কঠিন বন্ধনে বাঁধতে হবে।

সাহিত্যালোচনার অপরিহার্য অংগস্বরূপ বাইরের বই পড়ার প্রয়োজন এই স্তরে খুব বেশি। বিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে শুধু সাহিত্য নয়, নানা জ্ঞানবিজ্ঞানের বই পড়বার জন্য শিক্ষক ছাত্রদের উৎসাহিত করবেন।

তিন

বিদ্যালয়ের উচ্চতম দুই (বা প্রস্তাবিত নূতন ব্যবস্থায় তিন) শ্রেণীতে ছাত্ররা কৈশোর অতিক্রম করে' যৌবনে পদার্পণ করতে উদ্যত হয়।

বর্তমানে অনেক অনতিক্রান্তকৈশোর ছাত্র বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লেও বিদ্যালয়সমূহের পুনর্গঠনের ফলে অদূর ভবিষ্যতে বিদ্যালয়ে দুই বা তিন শ্রেণী ছাত্রদের অপেক্ষাকৃত পরিণতবয়স্ক হতেই দেখা যাবে।

এই বয়সের ছাত্রদের পরিণতি অনুযায়ী শিক্ষাদানপদ্ধতির পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। এই কিশোর যুবকেরা স্বাধীন মত পোষণ করতে আরম্ভ করে এবং বাইরের নানা বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই দুটি ভাব সুপরিচালিত হ'লে যেমন বাঞ্ছনীয়, কুপরিচালিত হ'লে তেমনই মন্দের আকর হয়ে ওঠে।

ছাত্রদের স্বাধীন মতামত গঠিত হওয়ায় তারা সমালোচনা করতে শেখে। এই বৃত্তি চিত্তোৎকর্ষের পরিচায়ক, কিন্তু উপযুক্ত অবলম্বন না পেলে নিকৃষ্টভাবে প্রযুক্ত হয়। যে সমালোচনা সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি নানা জ্ঞানের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হতে পারে, শিক্ষকের নিয়োগ ক্ষমতার অভাবে তা তাঁকেই অবলম্বন করে। ছাত্র ফাজিল হয়ে ওঠে, সব জিনিষ নিয়ে তামাসা করে' সকলকে ব্যংগ করে' আমোদ পায়।

তাড়নদ্বারা এই অবস্থার প্রতিকার করা অসম্ভব ও অবাঞ্ছনীয়। শিক্ষককে এ ক্ষেত্রে অবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা করতে হবে। দাবী করা তাঁদের অভ্যাসগত হয়ে গেছে বলে মনের মধ্যে একটি আদর্শ স্থাপন করে' তদনুযায়ী ব্যবহার ও মতামত তাঁরা ছাত্রসমাজের কাছে আশা করেন; কিন্তু মানুষ যন্ত্র নয়, কিশোরবয়স্ক ছাত্র শিশু নয়, তাই সংঘর্ষের উদ্ভব হয়। বহিরাগত শাসনে কোনো ফল হয় না, আন্তরিক ধৃতিই শৃংখলার ভিত্তি।

বিচারশক্তির উন্মেষের ফলে ছাত্রের মনেও একটা আদর্শ খাড়া হয়ে যায় এবং তদনুযায়ী সে-ও চায় যে তার দাবী শিক্ষক পূরণ করবেন। তদুপরি সাধারণত বাংলা শিক্ষার মান এত নিচু যে তাতে ছাত্রদের বুদ্ধি

বৃত্তির অর্ধমাত্র নিয়োজিত হয়। ক্লাসের পড়া যদি তার সম্পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারত তবে চাঞ্চল্যের অবকাশ সে পেত না।

বিদ্যালয়ের পাঠের মানের নিম্নতা এর আগের স্তর থেকে কিছু কিছু অনুভূত হ'তে থাকে। সেই স্তরেই দেখা যায় যে বাংলার যথেষ্ট গভীর জ্ঞান পাঠ্যক্রমে চাওয়া হয় না এবং শিক্ষক বা পরিদর্শক কেউ দাবী করেন না। নির্দিষ্ট পাঠ আয়ত্ত করার জন্য সাধারণ বুদ্ধিমান বালকের বিশেষ পরিশ্রম করতে হয় না। এর আগের স্তরে এই কারণে বালকবালিকার অতিসচেতন মন কখন কখন বিপর্যয় ঘটায় এবং এই স্তরেও পাঠের প্রতি শ্রদ্ধাবিযুক্ত হয়ে তার সাফল্য হারায়।

সাম্প্রতিক সরকারি পাঠ্যক্রমে বাংলার মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা হয়েছে, কিন্তু এতে ব্যাপকতর সাহিত্যসাধনার পরিবর্তে অধিকতর ব্যাকরণ নির্দিষ্ট হওয়ায় ছাত্রদের মানসিক পরিণতি অপেক্ষা মুখস্থবিদ্যার সহায়তা হবে বলে অনুমান করা যায়।

অনেকে বলে থাকেন যে বিদ্যালয়ের পাঠের আদর্শ উঁচু হ'লে যে সব ছাত্রেরা পড়ায় ভাল নয় তাদের প্রতি অবিচার করা হয়, তারা বারে বারে 'ফেল' করে। এর প্রতিকারের জন্য কোনো কোনো বিদ্যালয়ে সাধারণ পাঠ সমান রেখে তারপর ছাত্রদের বুদ্ধির তারতম্যানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করে বিশেষ পাঠ দেওয়া হয়। একই কবিতা যদি 'স্কুল ফাইন্যাল' থেকে আরম্ভ করে এম-এ পর্যন্ত সকল পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ধারিত হ'তে পারে, তবে একই শ্রেণীর একই পাঠ্য বিভিন্ন ছাত্রের বিভিন্ন বুদ্ধি-মানের আদর্শে পড়ানো নিশ্চয়ই সম্ভবপর।

ছেলেদের বুদ্ধি-মান আজকাল অতি সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা হয়। কিন্তু কাজের প্রয়োজনে এদের উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন মোটা ধাপে ভাগ করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পাঠের তুলনায়

এদের পাঠগ্রহণ ক্ষমতার অনুপাত কষে' কারো কারো ন' মাসে, বারোমাসে বা আঠারো মাসে বছর হয় বলে' দেখা যায়। ছাত্রদের বুদ্ধি-মানের এই মোটা বিভাগের প্রতি লক্ষ্য রেখে পৃথিবীর অগ্রগামী কোনো কোনো দেশে প্রত্যেক শ্রেণীতে ত্রি-ধারায় পঠন, পাঠন ও পরীক্ষাগ্রহণের রীতি প্রচলিত হয়েছে। আমাদের দেশে এর প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের (মুদালিয়র) প্রস্তাবে উল্লিখিত হয়েছে।

বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীর পাঠের আদর্শচ্যুতির অপর এক কারণ এই যে শেষ দুই শ্রেণীর সমস্ত পাঠই বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার অভিমুখী হয়ে থাকে বলে' পরীক্ষা-প্রশ্নের সম্ভাবনার বাইরেও কোনো বিষয়ের আলোচনা করতে শিক্ষক বা ছাত্র কেউই চায় না। এর জন্য পরীক্ষাব্যবস্থা ও পঠনপাঠনের আদর্শ উভয়েরই পরিবর্তনের প্রয়োজন।

অনেক ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রতি সাধারণ অবহেলার ফলেও পাঠের হানি ঘটে থাকে। সমাজ ও বিদ্যালয়ের সমগ্র আবহাওয়া এর মূলে। মাতৃভাষা, আঞ্চলিক ভাষা ও শিক্ষার বাহনরূপে যে সম্মান বাংলার প্রাপ্য তা তাকে দেওয়া হয় না। বহু ক্ষেত্রে বাংলা শিক্ষা ও শিক্ষকের সম্মান বিদ্যালয়ে খুব কম। এটি যুগসন্ধিকালীন অবস্থা হতে পারে, কিন্তু প্রতিকারাভাবে এর স্থায়িত্বলাভ অসম্ভব নয়।

বাংলার শিক্ষককে স্বপ্রতিভার দ্বারা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে হবে। তিনি নিজের উৎসাহে ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করবেন ও বৈদগ্ধ্যের দ্বারা তাদের বিদ্যানুরাগী করবেন। পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ বা বাহ্যিক সম্মানের চেয়ে যে বিদ্যানুরাগ বড়, একথা অনুভব করলে তারা বাংলার প্রতি সশ্রদ্ধ হবে ও তার সাধনায় আয়াস স্বীকার করবে।

বহির্জগতের সম্বন্ধে সচেতনতা এই স্তরের মনোবিকাশের আরেকটি

লক্ষণ। ছাত্রের আত্মসচেতনতার উন্মেষ প্রথমেই হয়েছিল, এখন জগতের রহস্যময় রূপের চেয়ে বুদ্ধিগ্রাহ্য দিকটা প্রধানভাবে তার সামনে আত্মপ্রকাশ করে। শিশুর কাছে জগতের দৃশ্যপরম্পরা পরম সুন্দর চিত্রপরম্পরার মতো উদ্ঘাটিত হয়ে তার উৎসাহ ও কৌতূহলের উদ্রেক করে। কিন্তু বড় হ'তে হ'তে জগতের প্রত্যেক ঘটনার কার্যকারণ সম্বন্ধ বুঝবার ও বিচার করবার চেষ্টার ফলে কর্মজগতের সংগে তার কিছু কিছু পরিচয় ঘটে। মনুষ্যত্ববিকাশের পক্ষে বাঞ্ছনীয় হ'লেও অনুপযোগী পরিচালনায় এই ভাব বিদ্যালয়ের মধ্যে সংকটের সৃষ্টি করতে পারে।

রাজনৈতিক আন্দোলনের আকর্ষণ অনেক সময়ে বহু দুঃখবেদনার কারণ হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের (মুদালিয়র) প্রস্তাবনায় শিক্ষকদের এই বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করা হয়েছে।

এর সংগে সংশ্লিষ্ট আরেকটি দুর্ঘটনা ছাত্রদের ধর্মঘট। এতে সমস্ত বিদ্যালয়ের পড়ার ব্যাঘাত হয় আর উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের উপর বিশেষভাবে উত্তেজনার ঝোঁক পড়ায় অনেকদিন ধরেই তাদের পড়াশোনায় মন থাকে না। রাজনীতির দিক দিয়ে বিচার না করে শিক্ষার দিক দিয়ে দেখতে হবে এতে কত ক্ষতি হয়। এতে বিদ্যালয়ের শৃংখলা যে শুধু সাময়িকভাবে ভাঙে তা নয়, ছাত্রদের সংযমের গোড়ায় আঘাত করে, তাদের মন পড়াশোনা থেকে অপসারিত হয়। ধর্মঘট কখন কখন ছাত্রদের স্বার্থরক্ষার অস্ত্ররূপে প্রযুক্ত হয়। তাতে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক আবহাওয়া ধ্বংস করে' কৃত্রিম শ্রেণীসংগ্রামের আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ এই উত্তেজনা এমন সংক্রামক ব্যাধিতে দাঁড়িয়ে যায় যে ছাত্র সমাজের বিচারবুদ্ধি লুপ্ত করে' অন্ধ অনুকরণের অভ্যাসের সৃষ্টি করে।

এর বিরুদ্ধে বিরোধিতা করার সময়ে মনে রাখতে হবে যে ছাত্রেরা

সাধারণভাবে মন্দ বা নির্বুদ্ধি নয়, তারা মোহ ও উত্তেজনার বশবর্তী। এ কথাও ভুললে চলবে না যে তারা দেশের যে মংগলসাধনের কল্পনায় পথভ্রষ্ট হচ্ছে তার সুপথ নির্দেশ করার ভার শিক্ষকসমাজের। পীড়নদ্বারা যে এর গতিরোধ করা সম্ভব নয় তার প্রমাণ হয়ে গেছে। নিবারণের অন্য পথ খুঁজতে হবে। যে বিচারবুদ্ধি ও চারিত্রিক দৃঢ়তা ছাত্রসমাজকে এই গড্ডালিকাপ্রবাহ থেকে রক্ষা করতে পারে তা শিক্ষকের দেয়।

মুদালিয়র কমিশনের প্রস্তাবে সমাজ ও শিক্ষানিকেতনের যে অংগাংগি ভাবের পরিকল্পনা করা হয়েছে তার প্রয়োগ এই সমস্যার সমাধানে প্রধান ভাবে কার্যকর হ'তে পারে; কিন্তু শুধু সমাজসেবায় নয়, জ্ঞানার্জনেও ছাত্রজীবনের সার্থকতার পথ দেখাতে হবে। জ্ঞানের মূল্য ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতে হবে এবং জ্ঞানতপস্যার ও আবিষ্করণের দ্বারা দেশসেবা যে দেশপ্রেমের প্রধান অংগ তা তাদের উপলব্ধি করাতে হবে।

এই আদর্শোন্নয়নের ক্ষেত্রে, মনোগঠনের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাধনা প্রধান অংশ গ্রহণ করতে পারে। বাংলা ভাষা, মাতৃ ভাষা, বাংলা সাহিত্য, বাঙালীর জাতীয় সাহিত্য, তারই সুপরিচালিত শিক্ষার ওপর জাতীয় চরিত্রের ভিত্তিপত্তন হবে।

মাতৃভাষাশিক্ষার সাধারণ পদ্ধতি

সমস্ত শিক্ষার যা মূল পদ্ধতি, মাতৃভাষার শিক্ষাও সাধারণভাবে সেগুলির ওপর স্থাপিত। আধুনিকতম শিক্ষানীতিতে মানবস্বভাবের প্রকৃতিদত্ত শিক্ষাধারাকে শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে গ্রহণ করা হয়েছে, মাতৃভাষার শিক্ষাও সেই ধারার অনুসরণ করে।

প্রকৃতির কোলে যে নিয়মে মানুষ ধীরে ধীরে তার এই বিরাট সভ্যতা গড়ে' তুলেছে ও জ্ঞানভাণ্ডার আহরণ করেছে সেই নিয়মকে মানব-সন্তানের চরিত্রবিকাশ ও জ্ঞানলাভের স্বাভাবিকতম পন্থা বলে স্বীকার করা হয়। এই নিয়মকে প্রধানত তিনটি ধারায় নিবদ্ধ করা যায়, যথা :—(ক) অভিজ্ঞতা ও ভ্রমের মধ্য দিয়ে, (খ) পর্যবেক্ষণ ও চিন্তাশক্তির ব্যবহার দ্বারা ও (গ) ইন্দ্রিয়নিচয়ের সাহায্যে শিক্ষা। শিক্ষাকে নিশ্চেষ্ট শ্রবণমননের ক্ষেত্র থেকে কর্মক্ষেত্রে টেনে নামিয়ে এই তিন নীতির প্রয়োগ হয়। কর্মদ্বারা শিক্ষাপদ্ধতি আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের নবতম অবদান।

মানুষ অভিজ্ঞতা ও শ্রমের মধ্য দিয়ে সত্যকে অনুভব করে' আবিষ্কার করে, তাই তার জ্ঞানের ভিত্তি। কিন্তু ছোটবেলায় মাতৃভাষা শেখে শিক্ষকের উপদেশে নয়, নিজের চেষ্টায়। তার চারিদিকে যে বাংলা শব্দের প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে তার ধ্বনিপ্রতিধ্বনি তার কানে এসে ঠেকে। তারই মধ্য থেকে তার শব্দসম্পদ গঠিত হয় ; চারিদিকে যে বাক্যগুলি উচ্চারিত হচ্ছে তারই অবচেতন অনুকরণে সে স্বাভাবিক ভংগীতেই নিজের বাক্যগুলি গড়ে' তোলে। শিশুর বাক্যগঠনে বা উচ্চারণে ভুল হ'লে সব সময়ে মাতাপিতা যে ভুলটা দেখিয়ে দেন, তা নয় ; তবু সে নিজের পর্যবেক্ষণ দ্বারা

আপনাকে সংশোধিত করে নেয়, সবাই যেমন কথা বলে তেমনি ভাবে কথা বলতে প্ররোচিত হয়।

শিশুর স্বাভাবিক পর্যবেক্ষণ ও চিন্তাশক্তির ব্যবহার তার মনের উৎকর্ষ সাধন করে' ও তাকে স্বাধীনভাবে জ্ঞানানুসন্ধানে প্রবৃত্ত করে' তার মনুষ্যত্বের ভিত্তি স্থাপন করে; কিন্তু স্কুলে সে একটি নূতন ব্যাপারের সম্মুখীন হয়, সেটা শিক্ষকের নির্দেশ। এই নির্দেশ যদি সুপরিচালিত না হয়, যদি শিশুরা নিজ প্রচেষ্টাকে খর্ব করে ফেলে, তাহ'লে যে শুধু তার ভবিষ্যৎ পূর্ণতার বাধাস্বরূপ হয় তা নয়, কৃত্রিম নিশ্চেষ্টতা তার বিদ্যালয় জীবনকে দুঃখময় করে।

বাংলাদেশের অনেক ভাল বিদ্যালয়ে নিচের শ্রেণীতে ক্রীড়া বা কর্মমূলক কোনো আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে বলে' শিশুর স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির পরিচালনার সুযোগ ঘটে, কিন্তু প্রায় সকল বিদ্যালয়েই ওপরের ক্লাসে বালকবালিকার স্বচেষ্টার চেয়ে গুরূপদেশকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ফলতঃ শিক্ষার্থী যখন নিচের ক্লাসগুলিতে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করতে করতে উপরের ক্লাসে উঠে সহসা এক কৃত্রিম পদ্ধতির বশবর্তী হয়ে পড়ে তখন তার চিন্তাধারার সূত্র হারিয়ে যায়। অনেক সময়ে দেখা যায় যে শিশু হয়তো নিচের শ্রেণীগুলিতে খুব কৃতকার্যতার সংগে পড়াশুনো করত, কিন্তু ওপরের শ্রেণীতে উঠে তার বুদ্ধি খুলতে চায় না।

তাই পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার একটা স্বাভাবিক ক্রম রক্ষা করা চাই। নিচের শ্রেণীর শিশুর জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বস্তুর ওপর নির্ভরশীল; বস্তু থেকে বাক্যে এবং বাক্য থেকে বস্তুতে যাতায়াত করে', মানবসভ্যতার পুনরাবৃত্তি করে' সে শিক্ষা পায়। এইজন্য বস্তু হ'ল শিশু-শিক্ষার প্রধান উপজীব্য, কিন্তু সব সময়ে বস্তু উপস্থিত করা সম্ভব হয় না এবং তার প্রয়োজনও সকল ক্ষেত্রে থাকে না, তখন চিত্র, মানচিত্র, মডেল,

নক্সা, ব্ল্যাকবোর্ডের কাজ প্রভৃতি বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করে। এইভাবেই উদাহরণের দ্বারা, নক্সার সাহায্যে, বালকের স্বাভাবিক পর্যবেক্ষণশক্তির ব্যবহারে, বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা চলতে পারে। বিজ্ঞানের ক্লাসে যেমন পরীক্ষার দরকার, তেমনি সাহিত্যের ক্লাসেও প্রত্যক্ষ ও প্রমাণের প্রয়োজন হয়।

ইন্দ্রিয়নিচয়ের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া অন্যান্য বিষয়ের মত ভাষা শিক্ষারও একটি মূলনীতি। শিশু কানে শুনে ভাষা আয়ত্ত করে; যে কালা সে বোবাও হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে শিশুর শিক্ষাও সেই স্বাভাবিক নীতিকে অবলম্বন করে। শিশুর প্রথম পাঠ শিক্ষকের সংগে কথাবার্তা বলা, গল্প করা; তারপর সে নানা খেলা ও কাজে লিপ্ত হয়ে, সৃষ্টি প্রেরণার তাগিদে ভাষাশিক্ষার পথে অগ্রসর হয়। শুধু কান নয়, সমুদয় ইন্দ্রিয় দ্বারা সে শিক্ষা করে।

শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয়সমূহকে জাগ্রত করার জন্য উজ্জ্বল রঙের ছবি দেখাতে হবে, তাছাড়া তাকে নানারকমের জিনিষ বা জিনিষের মডেল এনে দিতে হবে, যাতে নিজে স্পর্শ করে', মেপে, তুলনা করে', তার ধারণাসমূহ বিশদ হয়। বস্তুসম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট না হ'লে সে পরিষ্কারভাবে, প্রাঞ্জল-ভাষায় তার বর্ণনা করতে পারবে না। বোর্ডের ব্যবহারও নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বিশেষত শিক্ষক যদি ছবি আঁকতে পারেন তবে তাঁর হস্তচালনার পদ্ধতি দেখতে পেলে শিক্ষা পূর্ণতর হবে। পড়া ও লেখার আগে শিশু ছবি এঁকে আত্মপ্রকাশ করে বলে' শিশুশ্রেণীতেই চিত্রাংকনের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক।

সর্ববৃত্তির উন্মেষ ও মার্জনার চেষ্টার বিকাশ হয় কর্মশীলতার দ্বারা। শিশুকে যদি সব জিনিষই দেখেশুনে, মেপে, তুলনা করে', ব্যবহার করে', শিখতে হয়, তবে তার শিক্ষা হবে অখণ্ড কর্মস্রোতের মধ্য দিয়ে

(learning by doing), শান্ত ছেলের মত বেঞ্চিতে বসে' বই পড়ে' নয়। কাজের মধ্যে দিয়ে যে শিক্ষা লাভ করা যায় তাই প্রকৃত শিক্ষা, সেইজন্য আসল কর্তা হবে শিশু, শিক্ষক হবেন নিমিত্তমাত্র। সে যেন তার নিজের প্রত্যক্ষ, অনুমান ও অনুভবের দ্বারা পাঠ্যবিষয় বুঝে নিতে পারে। শিক্ষক কেবল পথপ্রদর্শন করবেন।

এই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার কতকগুলি উপায় সংক্ষেপে নির্দেশ করা যায়ঃ—

প্রথমত, শিক্ষার্থীকে নিজের চেষ্টা ও বুদ্ধিদ্বারা বিদ্যাকে আয়ত্ত করতে হ'লে তার শিক্ষার ভিত্তি পরিচিত স্থলে স্থাপিত করতে হবে, তবেই সে অনুসন্ধানের দ্বারা অজ্ঞাতকে আবিষ্কার করে' নিতে পারবে। পরিচিত বস্তুজগত থেকে তার শিক্ষা সুরু হবে। রোজ যে জিনিষ সে দেখে থাকে তারই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যে সে ক্রমশ অজানার রাজ্যে ও ভাবজগতে বিচরণ করতে শিখবে। শিক্ষার গতি হবে জানা থেকে অজানায়, নিকট থেকে দূরে, বস্তু থেকে ভাবে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষা হবে আরোহপদ্ধতিতে (Inductive method) পূর্বাবিষ্কৃত তথ্যসমূহের কথা শুধু বসে' বসে' শুনলে শিক্ষার্থীর চলবে না, নিজের চেষ্টায় সেগুলিকে পুনরাবিষ্কার করতে হবে। ভাষা ও সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি তার সামনে যথেষ্ট স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারলে সে শিক্ষকের সামান্য সহায়তায় অন্তর্নিহিত সাধারণ নিয়মসমূহ বের করতে পারবে। সূত্র কণ্ঠস্থ করিয়ে, বক্তৃতা দিয়ে নিশ্চেষ্ট করে' রাখলে সে তোতাপাখীর মত পরের বুলি আওড়াতে আওড়াতে অনুকরণশীল হয়ে পড়বে, যে বুদ্ধি মানুষকে নব নব আবিষ্কার ও উন্নতির পথে প্রণোদিত করে সেই বুদ্ধি তার একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।

তৃতীয়ত, শিক্ষার্থীকে উদ্যমে প্রবৃত্ত করতে হ'লে তার পড়াশোনা

চিত্তাকর্ষক করতে হবে। শিশুর মধ্যে কল্পনাপ্রবণতা ও স্বাধীনতাপ্রীতি এত প্রবল যে শাসনদ্বারা তাকে প্রতিহত করা যায়, কিন্তু আকৃষ্ট করা যায়না। তার যাতে পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ আসে, যাতে পড়তে পড়তে সে বিরক্ত হয়ে না পড়ে, তাই খেলা ও কাজের ছলে পড়ার পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে। অবসাদগ্রস্ত (bored) মন নিয়ে পড়লে সেই পড়ায় কোনো লাভ হয়না, এইজন্য শিক্ষার আধুনিকতম পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে রুটিনের বাঁধাধরা নিয়মে আবদ্ধ করা হয়না, রুটিন তার স্বপ্রণোদিত কর্মপ্রেরণার অনুসরণ করে। এইজন্য নিম্নশ্রেণীতে খেলা ও কাজের মধ্য দিয়ে নানাপ্রকার শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন হয়েছে এবং উচ্চ-শ্রেণীতেও চিত্র, আলোচনা, অভিনয়, কর্মপরিকল্পনা প্রভৃতি দিয়ে পড়াকে চিত্তাকর্ষক করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। প্রকৃতি শিশুকে যেমন আনন্দ ও কর্মের অধিকারী করে' অংকুরিত করেছিল, মানুষ তাকে তেমনি করেই বিকশিত করবে।

এখানে 'খেলা' এবং 'কাজ' সম্বন্ধে কিছু বলার দরকার। কথায় বলা হয়ে থাকে 'শিশুর খেলাই কাজ আর কাজই খেলা', খেলতে সে ভালবাসে, কিন্তু বড়-সাজার ইচ্ছা ও কল্পনা (make-believe) তার এত প্রবল যে কাজ করতে সে আরো ভালবাসে। তার খেলাও কাজেরই অনুকরণ। নির্ঝরিণীর উদ্দামতাকে মানুষ যেমন নিজের কাজে লাগায় তেমনি শিশুর এই ক্রীড়াশীলতাকেও তার শিক্ষার কাজে নিযুক্ত করা হয়, 'কাজ-কাজ' খেলা থেকে সে সত্যিকারের কাজে উপনীত হয়।

শিক্ষার উপরি-উক্ত উপায়সমূহের প্রয়োগের জন্য যে-সব উপকরণের প্রয়োজন হয় পূর্বেই প্রসংগক্রমে তার কিছু কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা এই যে বহুবিধ ব্যয়সাধ্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার ছাড়া আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিকে সফল করা যায়না। যে-সব সাজসরঞ্জাম

বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেগুলি পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানসম্মত হ'লেও এবং শরীর ও মনের বিকাশের পক্ষে তাদের উপযোগিতা থাকলেও প্রত্যক্ষ শিক্ষার আসল উপাদান শিক্ষার্থীর প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা। বুনিয়াদি শিক্ষাবিধানে যে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে তার উপকরণ স্বাভাবিক ও সুলভ। বিলেতি উপকরণের প্রয়োগ করতে চাইলেও বই দেখে নক্সা করে' তার অনুরূপ জিনিষ তৈরি করিয়ে নেওয়া যায়। অনেক সময়ে সাধারণ নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির দ্বারা সেগুলির কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। উপরন্তু আগামী যুগের শিক্ষককে এ-কথা ভুল্‌লে চলবেনা যে কিণ্ডারগার্টেন, মণ্টেসরি প্রভৃতি পদ্ধতির যন্ত্রপাতির বাঁধাধরা ছক শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমশ কালবারিত হয়ে আসছে।

বাংলাশিক্ষার জন্য প্রযুক্ত দু'একটি উপকরণের ব্যবহারের সাধারণ নির্দেশ নিচে দেওয়া হ'ল।

ভাষাশিক্ষার প্রথম অবস্থায় উজ্জ্বল, রঙিন জিনিষ, ছবি, ব্ল্যাকবোর্ড, দেওয়ালপত্র (posters) ও শিক্ষকের কথাবার্তাই প্রধান।

নিচু কানাওয়ালা বাক্সে বালি ঢেলে (sand-tray) তার ওপর ছোট ছোট খেলনা বা মডেল সাজিয়ে দেখালে বিষয়বস্তু ছবির চেয়েও বাস্তবরূপে প্রতিভাত হয়। বিদ্যালয়প্রাংগনে বালির ঢিপি করে' শিক্ষার্থীদের নানারূপ পরিকল্পনারচনায় নিয়োজিত করা এরই প্রকারভেদ। বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট মাঠের কোণায়, গাছের তলায়, গ্রাম, নগর, পাহাড়পর্বত, নদী রচনা করে' শিক্ষাকে উজ্জ্বল করা যায়। রবীন্দ্রনাথের "নদী" বা "ছোটনদী" কবিতার পটভূমিকে এইভাবে রূপায়িত করতে পারলে শিক্ষার্থীর দৃষ্টির সামনে কাব্যজগৎ মূর্ত হয়ে উঠবে।

অভিনয় শিক্ষার একটি বড় অংগ। যা অন্য কোন প্রকারে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার বিষয় হ'তে পারেনা, অভিনয়ের সাহায্যে তা প্রত্যক্ষবৎ হবে।

অভিনয়ের সংগে যদি পোষাকপরিচ্ছদ ও সাজসরঞ্জামের ব্যবহার করা যায় তবে তো সোনায় সোহাগা।

পরিচ্ছেদের শেষে মাতৃভাষার শিক্ষার দুটি বিশেষত্বের উল্লেখ করব; প্রথম তার শব্দসম্পদ, দ্বিতীয় অন্যান্য শিক্ষার সংগে তার পার্থক্য।

শব্দ ভাষার উপাদান। শিশু প্রত্যহ যা করে, যা দেখে বা যার ব্যবহার করে, প্রত্যেক কাজ বা জিনিষের দ্যোতক শব্দ আছে। সেই শব্দসমূহ তার কথোপকথনের মূলধন। সেইগুলির ব্যবহারদ্বারাই তার শিক্ষা আরম্ভ হয়। ঘরে, বিদ্যালয়ে এবং ঘর ও বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী পথে, যে-সব কাজ বা খেলায় সে ব্যাপৃত থাকে তাকে অবলম্বন করে' আলোচনা করতে করতে ক্রমশ নূতনতর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাকে অজানার রাজ্যের পথপ্রদর্শন করতে হয়; সে বাড়িতে কি দিয়ে ভাত খায় সেই থেকে বিদ্যালয়ের যে-যে বন্ধুবান্ধব তার প্রিয় বা আকাশে যে এরোপ্লেন সে উড়্‌তে দেখ্‌লো সমস্তই তার আলোচনার বিষয়ীভূত হয়। এতে জানার ওপর অজানার ভিত্তি স্থাপিত হয়, ঘর ও বিদ্যালয় একসূত্রে গ্রথিত হয়, শব্দসম্পদ বৃদ্ধি পায়।

মনোবিকাশের সত্যের দিক থেকে পাঠ্যপুস্তকের পরিচ্ছেদে পাঠে পাঠে বিভক্ত করে' ধাপে ধাপে শব্দ পরিবেশনের চেয়ে কর্মকেন্দ্রিক চেষ্টার তাগিদে, শিশুর আন্তরিক অনুপ্রেরণায় শব্দসম্পদ বৃদ্ধির পন্থা অনেক বেশি কার্যকর।

ভাষাশিক্ষার সংগে অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষার পার্থক্য হ'ল এই যে চরিত্র গঠনের সাধারণ উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্যান্য শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানবৃদ্ধি ও বৃত্তিনিচয়ের অনুশীলন, কিন্তু ভাষাশিক্ষার উদ্দেশ্য তার নিজের মধ্যেই নিহিত, কারণ ভাষাই সকল শিক্ষার ধারক ও বাহক। কেবলমাত্র সৎপ্রণালীই শিক্ষাবিষয়কে অবলম্বন করে' শিশুমনোবৃত্তির সম্যক উন্মেষ করতে

পারে বলে' অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষার তথ্যগুলি অপেক্ষা পদ্ধতিই প্রধান ; কিন্তু মাতৃভাষার শিক্ষায় বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি উভয়েরই সমান প্রাধান্য ; কেননা ভাষা মনোবিকাশের যন্ত্রমাত্র নয়, শিশুর বিকশিত মনের পরিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য এর প্রতি অংগের ওপর তার আধিপত্য চাই। বাংলা-ভাষা-শিক্ষা বাঙালী শিশুর আদি ও প্রধান শিক্ষা ; অন্য বিষয়ের শিক্ষার ভূমি বাংলা, তাই ভাষাযন্ত্র অধিকার করতে না পারলে কোনো শিক্ষারই পূর্ণতা লাভ হয় না। বুঝতে না পারার দোষের চেয়ে অধীত বিষয় প্রকাশ করতে না পারাটাই শিক্ষার্থীর দুর্বলতার কারণ হ'তে বেশি দেখা যায়।

অনুভূতির বিকাশক্ষেত্ররূপে সাহিত্যই অপরাপর বিষয়সমূহের উপযুক্ত মিলনভূমি। সাহিত্যপাঠক্রমে কবিতা ও গল্প ভিন্ন অন্যান্য বিষয়েরও আলোচনা হয়ে থাকে। এই অনুবন্ধের ফলে সাহিত্যশিক্ষা সর্বাংগীন হয়, শিক্ষার বাহন মাতৃভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার ক্ষমতা জন্মায় ও ভাবজগতের সংগে জ্ঞানজগতের সংযোগ স্থাপিত হয়ে জ্ঞান জীবনে সত্য হয়ে ওঠে। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের মতে শুধু বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধস্থাপনই যথেষ্ট নয় ; এক পরিকল্পনায় সর্ববিষয়কে গ্রথিত করা অনুবন্ধ প্রণালীর প্রকৃত প্রয়োগ।

ভাষাশিক্ষার শাখা-প্রশাখা

জীবনের প্রতি মুহূর্তে মানুষের পক্ষে ভাষার ব্যবহার অপরিহার্য ; কর্ম, চিন্তা ও ভাবের বিচিত্র বিকাশের বাহন ভাষা। তাছাড়া, পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের জন্য, পরস্পরের সংগে যোগসাধনের জন্য, সাহিত্যরসোপ-ভোগের আনন্দলাভের জন্য ভাষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ভাষার সংসর্গ ও প্রয়োজন মানব জীবনে এত নিবিড়, গভীর এবং ব্যাপক বলে, ভাষার শিক্ষা বিস্তৃত এবং নিগূঢ় হওয়া চাই।

মানুষ কথার সাহায্যে পরস্পরকে নিজের প্রয়োজন জানায় এবং সহানুভূতি, ভালবাসা, রাগ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। ধূর্তব্যক্তি ভাষার ছটায় ভুলিয়ে লোককে ভ্রান্ত করতে পারে, ভাষার দ্বারা বাগ্মিগণ জনতা আন্দোলিত করেন।

বলতে শেখা শিক্ষার অংগ। শিশু যখন বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণীতে আসে তখন সে ভাল করে' গুছিয়ে কথা বলতে পারে না, শিক্ষককে তার সংগে আলাপ-আলোচনা করে' তাকে নিজের প্রয়োজনের কথা, অভিজ্ঞতার কথা বলতে উৎসাহিত করে' এমনভাবে গুছিয়ে কথা বলতে শেখাতে হবে যাতে অর্থ পরিষ্কার হয়। প্রাঞ্জলভাবে নিজের কথা অপরকে বোঝাতে পারলে জীবনে ভুল-বোঝার দুঃখের হাত এড়ানো যায়, কাজ ও কাজের নেতৃত্বের পথ সুগম হয়। তারপর, শিক্ষার্থীকে শুধু পরিষ্কার করে' বিশদভাবে নয়, এমনভাবে কথা বলতে শেখাতে হবে যাতে তার কথা অন্যকে প্রভাবিত করতে পারে। এই শক্তি সে বিদ্যালয়েই আয়ত্ত করবে, শুধু ক্লাসের কথাবার্তায় নয়, নানা কাজ এবং বক্তৃতা, তর্ক,

আলোচনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। অভিনয়, আবৃত্তি প্রভৃতির দ্বারা সুসাহিত্যের ভাষাকে রূপদানের অভ্যাস হ'লে নিজের বক্তব্যও উপযুক্ত ভাবভংগিসহকারে বলতে পারবে। কোনো শিক্ষার্থীর মধ্যে বাক্‌প্রতিভা নিহিত থাকলে বাগ্মীটিকে গড়ে তোলার ভার যেন বিদ্যালয় নিতে পারে।

মানুষ শুধু কথা বলে না, লেখাপড়া করে। শিক্ষার্থী পড়তে শিখবে, কেবল নিরক্ষরতা-দূরীকরণের জন্য নয়,—কাজকর্মে ও জ্ঞান আহরণে ভাষার মাধ্যম সফলভাবে ব্যবহারের জন্য, মানুষের সংগে ভাবযোগ-সাধনের জন্য, গভীর সাহিত্যরস উপলব্ধি করবার জন্য।

পড়তে শেখার প্রথম প্রয়োজন জ্ঞান আহরণ করার ও কাজের কথা পড়ে' বোঝার জন্য। এই কারণে শিশুকে তার পড়ার মধ্য দিয়ে জীবনের ব্যবহারের সংগে পরিচিত করে' দিতে হয়। অন্যান্য শ্রেণীতে সে বাংলা ভাষার মাধ্যমে যে সব বিষয় পড়বে সেগুলিকে সহজে আয়ত্ত করার মত ভাষাজ্ঞান তার চাই। ভাষার দুর্বলতার জন্য জ্ঞানার্জন কঠিন হ'লে মাতৃ-ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে পেয়েও জাতীয় জীবনে শিক্ষা সফল হবে না।

শিশু অল্প বয়স থেকে সাহিত্যরস উপভোগ করতে পারে ; যখন সে ছেলে ভুলোনো ছড়া আর ছোট গল্প পড়তে শিখবে তখন থেকেই সাহিত্যের, সংগে তার পরিচয়। এখান থেকে তাকে উদারতর সাহিত্যক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করে' দিতে হবে যাতে তার আনন্দ ও কাব্যাস্বাদ দুইই ঘটে। তারপর সাহিত্য শিক্ষিত মনের যে মিলন সাধন করে তার মূল্য কম নয়। পাশ্চাত্ত্য ভাবে অনুপ্রাণিত শিক্ষিত বাঙালীর শিক্ষিত ইংরেজের সংগে যতটা মিল আছে অশিক্ষিত বাঙালীর সংগে তার একাংশও নেই বলে' রবীন্দ্রনাথ দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাঙালীদের মধ্যে সেই অন্তরংগতা স্থাপিত করতে হবে, দেশের সংগে দেশবিচ্ছিন্ন শিক্ষিত বাঙালীর মিলন সাধন করতে হবে, তাদের দেশকে চেনাতে হবে।

যেমন জীবনে, তেমনি বিদ্যালয়ে, ভাষার দুই ব্যবহার, এক কার্যিক ও জ্ঞানিক এবং অপর ভাবময় ও সাহিত্যিক। শিশু যখন প্রথম পড়তে শেখে তখন ছড়া, গল্প ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আনন্দে পাঠের পাথেয় সঞ্চয় করে' ক্রমশ সাহিত্যের মাধ্যমেই নানা জ্ঞানবিজ্ঞানের সন্ধান পেতে থাকে, তখন সে দেশের জগতের নানা তথ্য আহরণ করতে ও জীবন সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারে। এইজন্য সাহিত্যপাঠের প্রসংগে বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের স্থান আছে। উপরন্ত সাহিত্যশ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধপাঠে যে শব্দ সম্ভার ও ভাষাব্যবহার সে আয়ত্ত করে তার সহায়তায় অন্যান্য বিষয়ের পাঠও সহজ ও সফল হয়।

অপরপক্ষে সাহিত্যের দিকটা বিদ্যালয়ে অবহেলা পায়। বিদ্যালয়ে সাধারণত যে পদ্ধতিতে এবং যতটুকু সাহিত্য পাঠ হয় তার সাহায্যে সাহিত্যবোধ জাগ্রত করা কঠিন, এইজন্য সাহিত্যোপভোগের পাঠের দরকার এবং ছাত্রেরা বিদ্যালয়ের পুস্তকাগারের গ্রন্থাবলী যাতে স্বেচ্ছায় উপভোগ করতে পারে সেই শিক্ষা তাদের দেওয়া চাই। বিদ্যালয়ে সাহিত্যালোচনার দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে মানসিক সংগ স্থাপিত করতে হবে। ছাত্রেরা যে শুধু সাহিত্যের সমালোচনা করবে তা নয়, সাহিত্যপাঠ ও অনুভব তাদের শিক্ষার অংগ হওয়া চাই। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের স্থষ্টি এক সংগে উপভোগ করতে পারলে সাহচর্য আরো নিবিড় হবে।

প্রশ্ন করা হয়, নিছক সাহিত্যপাঠের কোনো মূল্য আছে কিনা। বোধে সাহিত্যপাঠের পূর্ণতা; কিন্তু পাঠ তার প্রথম সোপান, এইজন্য সাহিত্যপাঠ, বিশেষ করে' কাব্যপাঠের যথেষ্ট মূল্য আছে। নিছক পাঠের ক্ষেত্রে অবশ্য নীরবের চেয়ে সরব পাঠ অধিক প্রভাবশীল; আবার এমনও হ'তে দেখা গেছে যে, যে বিষয় প্রথমে বোধগম্য হ'ল না সেটি বারবার পাঠে বোঝা যায়। এই বিষয়ে যথাস্থলে আরো আলোচনা করা হবে

পড়ার মত লেখাকে আনন্দ, ব্যবহার ও উপভোগের পথে আত্মপ্রকাশ ও সৃষ্টির রাজ্যে উত্তীর্ণ করে' দিতে হবে। প্রথম লিখবার সময়ে আনন্দ না পেলে লিখতে শেখা শিশুর পক্ষে কঠিন, তাই যা তার ভাল লাগে সেই সব বিষয় অবলম্বনে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত লেখার দ্বারা তার লেখার শক্তি গঠিত হ'লে তবে ক্রমশ ব্যবহার বিশুদ্ধির অভ্যাস করাতে হবে। ব্যাকরণ সে প্রয়োগদ্বারা শিখবে আর ব্যবহার শিখবে সত্যকার ব্যবহারে। খেলায় আনন্দের সংগে কাজের সমন্বয় ঘটবে। খেলার ছলে ডাকঘর, ব্যাংক, দোকান ইত্যাদি স্থাপন করে' তার কর্মপদ্ধতির সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হবে, বেচাকেনা এবং কাজকর্মসম্বন্ধীয় কথাবার্তায় গুছিয়ে কথাবলার অভ্যাস হবে, লেবেল, টিকিট, বিল, তালিকা, বিজ্ঞাপন ও সাইনবোর্ডগুলি পড়তে পড়তে পড়ার অভ্যাস হবে এবং সেগুলি যারা লিখবে তাদের লেখারও অভ্যাস হবে। ডাকে দেবার জন্য এবং দোকানের কাজের সম্পর্কে চিঠি-পত্রাদি লিখে রচনা শক্তি বাড়বে। ইংরেজিতে চিঠি লেখার ক্লাস আছে; কিন্তু শ্রেণীকক্ষে বসে' শিক্ষকের হুকুমে লেখার চেয়ে চিত্তাকর্ষক কাজের সম্পর্কে আন্তরিক তাগিদে লেখা অনেক সরস হবে।

বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতিতে শুধু কাজ-কাজ খেলা নয়, বাস্তবিক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। ছেলেপিলেরা বাগান বা শিল্পসম্পর্কে যে কাজ করবে সে-সবের হিসাব করে', বর্ণনা লিখে, লেখাপড়া শিখবে।

এইসব খেলা আর কাজ একাধারে জ্ঞানবৃদ্ধি, ভাষাশিক্ষা, জাগতিক বিষয়ের অভিজ্ঞতা ও কর্মকুশলতা দান করে। এই পন্থায় শিক্ষার সাফল্য থেকে "পুস্তকহীন" শিক্ষার আদর্শের প্রবর্তন হয়েছে, তাতে শিশু ব্যবহারের দ্বারা পড়ালেখা শেখে এবং সাহিত্যানুভূতির জন্য ইচ্ছামত বয়সোপযোগী বই পড়ে, কিন্তু পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করে না।

এ-ভিন্ন ছাত্রেরা যদি মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টির উৎসাহ পায় অথবা হাতে-

লেখা মাসিক পত্রিকা, খবরের কাগজ বা দেয়ালপত্রী চালাবার সুযোগ পায় তবে সাহিত্যশিক্ষা সর্বাংশে সাফল্য লাভ করবে। শিশু চিরকালের স্রষ্টা, আত্মপ্রকাশের আকাংক্ষা তার মধ্যে অদম্য। এ চেষ্টা যাতে আদৃত ও সম্মানিত হয় শিক্ষককে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। তাছাড়া তাদের মধ্যে দু'একটি কবি ও সাহিত্যিকের অংকুর থাকতে পারে, তাদের সৃষ্টি-প্রেরণা যেন উৎসাহিত হয়। আমাদের রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের "হরিণবাটি" থেকে পালিয়ে সাহিত্যসাধনা করেছিলেন, ভবিষ্যতের রবীন্দ্রনাথকে অংকুরিত ও বিকশিত করার গৌরব যেন বিদ্যালয়ই পেতে পারে।

বলা, লেখা ও পড়ার মধ্য দিয়ে ধীরেধীরে, ধাপেধাপে ভাষাশিক্ষা ও সাহিত্য পরিচয় অগ্রসর হয়। এর বহু অংগ। কথা বলতে, বাগ্‌বিন্যাস করতে, তর্ক ও বক্তৃতা করতে, অভিনয় ও আবৃত্তি করতে শিখে ভাষার মৌখিক ব্যবহার আয়ত্ত হয়; শব্দ ও বাক্যের পাঠ শিখে পড়া শেখা হয়; পাঠ দুর্বল থেকে ক্রমে সাবলীল অনায়াসপাঠে উত্তীর্ণ হয়ে কঠিনতর পাঠের দিকে অগ্রসর হয়, সাহিত্য সাহিত্যশ্রেণী ছাড়িয়ে অন্যান্য বিষয়ের সংগে জড়িত হয়। লেখার ব্যাপারেও তাই। প্রথমে কাজ ও খেলার মধ্য দিয়ে, আনন্দের সংগে, ছোট ছোট বাক্যে, সহজ রচনা, তারপর ক্রমে সম্পূর্ণ প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি। এর আয়োজন অনেক,—কথাবার্তা, আলোচনা, তর্ক, বক্তৃতা, অভিনয়, বই পড়া, ব্যাখ্যা করা, পড়া দেওয়া-নেওয়া, ব্যাকরণ, অনুবাদ, প্রবন্ধ, গল্প প্রভৃতির মধ্য দিয়ে পরীক্ষাসাগর পার হ'লে তবে বালকের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে বলে' ধরা হয়।

এর মধ্যে বহু অপচেষ্টা ও পদ্ধতির অপপ্রয়োগ রয়েছে; বহু অনাবশ্যক প্রাধান্য পেয়েছে, বহু আবশ্যককে অবহেলা করা হয়েছে; বাহিরের ব্যাবহারিক, রাষ্ট্রিক, অর্থ ও রাজনৈতিক নানা কারণবশত বহুক্ষেত্রে মনো-বিকাশের সত্যকে খর্ব করা হয়েছে, আদর্শকে সংকীর্ণ ও বিকৃত করা

হয়েছে ; বহু ক্ষেত্রে প্রাচীনের প্রতি অনাবশ্যক মোহ ও নূতনকে গ্রহণ করায় কুণ্ঠার ফলে সুপদ্ধতির প্রয়োগ ব্যাহত হচ্ছে ; এই সবের মধ্য দিয়ে শিক্ষাতরীর পরিচালনা করতে হবে, বাস্তবের সমস্ত তুচ্ছতার সম্মুখীন হয়ে, তাকে জয় করে' আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মুখের পড়া

শিশু যখন বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণীতে ভর্তি হয় তখন তার চিত্তকে আকর্ষণ করার অন্যতম পন্থা হ'ল শিক্ষকের কথাবার্তা ও গল্প বলা।

গল্প বলা কথাবার্তার অংগ। গল্প যেমনভাবে শিশুকে মুগ্ধ করে' আকর্ষণ করে তেমন আর কিছুই নয়। পরীর গল্প সর্বদাই ছোটশিশুর প্রিয়। মন্তেসরি শিক্ষাব্যবস্থায় অসত্যকথনের অভিযোগে পরীকাহিনীর বিরোধিতা করা হয়েছে। সম্ভবত ওই শিক্ষাপদ্ধতি প্রথম অস্বাভাবিক শিশুদের নিয়ে প্রবর্তিত হওয়ায় তার মধ্যে স্বাভাবিক শিশুচিত্তের কল্পনার ঐশ্বর্যের দিকটা গ্রাহ্য হয়নি। বাস্তব অভিজ্ঞতাও এটা প্রমাণ করতে পারেনি যে পরীর গল্প মিথ্যার সহায়ক। কাজেই সবচেয়ে ছোট শিশুদের নানারকম পরীর গল্প বলা হয়ে থাকে; এছাড়া শিশুজীবনের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার গল্পও তারা আগ্রহের সংগে শোনে। কোনো কোনো শিশু গাড়ি, ঘোড়া, কলকব্জার প্রতি ঔৎসুক্য দেখায়। এই সব চাহিদা মেটাবার উপযোগী গল্প সংগ্রহ করার ভার শিক্ষকের, তিনি যেন সবরকমের গল্পের একটা সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারেন যাতে শিশুচিত্তের সব ভাব সমানভাবে বিকশিত হয়। এ ছাড়া জাতক, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, ঈসপের কাহিনী প্রভৃতিতে এমন অনেক গল্প পাওয়া যায় যাতে জীবজন্তু, গাছপালা, জিনিষপত্র প্রভৃতিকে নায়করূপে কল্পনা করা হয়েছে; এগুলিও শিশুদের প্রিয় হয়।

ক্রমশ শিশুর সামনে একদিকে যেমন দেশবিদেশের নানা রূপকথার ভাণ্ডার খুলে যাবে, অপরদিকে তেমনি ইস্কুলের গল্প, গার্হস্থ্যজীবনের গল্প

প্রভৃতি সে উপভোগ করতে আরম্ভ করবে। সহজে বই পড়তে শিখে সে গল্পের বই পড়তে আরম্ভ করবে কিন্তু তখনও তার গল্প-শোনার কাল অতিক্রান্ত হয়ে যাবে না এবং শুধু গল্প নয়, গল্পের ছলে দেশবিদেশের অথবা সাহিত্য ইতিহাসের নানা-কথা শুনতে সে চিরকাল ভালবাসবে।

গল্প ছাড়া সাধারণ কথাবার্তার মধ্য দিয়ে বাইরের অনেক জ্ঞান দেওয়া যায়। শিশু যখন অতি কষ্টে, ধীরে ধীরে কয়েক ছত্র পড়তে পারে মাত্র তখন বইকে তার জ্ঞানলাভের একমাত্র পথ করলে সে পথ তার কাছে একরকম রুদ্ধ থাকে। পড়তে শিখবার পরও কথার ছলেই অনেকখানি শিক্ষা হওয়া উচিত। শুধু নিচের ও নিম্ন মধ্য শ্রেণীর নয়, ওপরের ক্লাসের ছেলেদের কাছেও অধীতবিদ্যার চেয়ে শ্রুতবিদ্যা অধিক চিত্তাকর্ষক। কলেজের অধ্যাপনাও হয় "লেকচারের" দ্বারা।

শিক্ষক যদি যথেষ্ট সুন্দর চিত্রাদির সাহায্যে এবং সুন্দর ভংগীতে শিক্ষা দিতে পারেন তবে তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা বইয়ের শিক্ষার চেয়ে ফলপ্রদ হয়। মুখে মুখে জ্ঞানসঞ্চারণে ছেলেরা গ্রন্থকীট হ'তে পারে না, বইয়ের কথাকে সর্বস্ব মনে করে' পরীক্ষা দিতে যায় না, বক্তৃতার সংগে সমীক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা জ্ঞান অর্জনে অভ্যস্ত হয় বলে' প্রমাণের যাচাইয়ের অপেক্ষা রাখে। এই পদ্ধতিতে ক্লাসের পড়ার ওপর নির্ভর করতে হয় বলে' মন দিয়ে চটপট বুঝে নেওয়ার অভ্যাস হয়। অন্যথা ছাত্র যদি জানে যে সে যতই ফাঁকি দিক না কেন, শেষ মুহূর্তে বইয়ের কয়েকটা পৃষ্ঠা কণ্ঠস্থ করে নিলেই হবে, তা হ'লে শুধু যে তার শিক্ষা দোষপূর্ণ থেকে যায় তা নয়; শিক্ষার প্রতি তার শ্রদ্ধা কমে' যায়।

কানে শুনে শেখার পদ্ধতি বালস্বভাব সম্মত। বইয়ের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করা অল্পবয়সের রীতি নয়। বালক তার শরীরমনকে কাজে নিযুক্ত করে' যে জ্ঞান অর্জন করে তা দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপিত হয়।

মৌখিক শিক্ষার দুটো দিক,—শোনা এবং বলা, আদান এবং প্রদান। শিক্ষকের বলা ছাত্র শোনে আবার ছাত্রকেও বলতে হয়। মৌখিক পরীক্ষার দ্বারা কথাবলার যে অভ্যাস হয় তার মূল্য ছাত্রের ভবিষ্যৎ জীবনে খুব বেশি। জীবিকা উপার্জনের সম্পর্কে এবং চিঠিপত্র লেখায় ব্যতীত অধিকাংশ বয়স্ক লোক লেখার কাজ করেনা, তাদের জীবনের অধিকাংশ কাজ ও ভাবের আদানপ্রদান মুখের কথায় হয়। কর্মজীবনে প্রবেশ করার সময়েও অনেক ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষার প্রচলন আছে। এইসব কারণে ছাত্রদের গুছিয়ে, সপ্রতিভভাবে কথাবলার অভ্যাস করিয়ে দেওয়া আবশ্যক।

মৌখিক পরীক্ষায় পঠিত বিষয়ের জ্ঞানের পরীক্ষার সংগে কথাবলার সপ্রতিভ ভংগীরও পরিচয় নেওয়া হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণীর পরীক্ষা সম্পূর্ণভাবে মৌখিক এবং তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত কিছু লিখে ও কিছু মুখে পরীক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, ওপরের শ্রেণীতে একেবারে নেই। এ নিয়ম হানিকর। জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনের কথা ছেড়ে দিলেও ছাত্রদের যখন কর্মজীবনে পা দেবার মুখে মৌখিক পরীক্ষা দিতে হয় তখন অন্তত এই কারণেও বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত মৌখিক পরীক্ষার প্রচলন থাকার দরকার।

আরও নানারকমের অভ্যাসের দ্বারা ছাত্রের কথাবলার শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে। আবৃত্তি তার মধ্যে একটি। খুব নিচের শ্রেণীতে শিশুরা যখন ছড়ার আবৃত্তি আরম্ভ করে তখন থেকে উঁচু ক্লাসের বড় বড় কবিতার আবৃত্তি পর্যন্ত একই শক্তির ক্রমবিকাশ হয়। আবৃত্তিতে শিশুর মৌলিক রচনার সুযোগ নেই বলে' কেউ কেউ একে মৌখিক কাজের মধ্যে ধরতে চাননা, কিন্তু এতে আত্মপ্রকাশের ভংগীর বিকাশ হয়। আবৃত্তির উপযোগী কবিতার সংগ্রহপুস্তক বাংলায় বেশি নেই, কিন্তু

শিশুপাঠ্য ও সাধারণপাঠ্য কবিতার বই ও মাসিকপত্রাদি থেকে বেছে নিয়ে শিক্ষক নিজের সংগ্রহ তৈরি করতে পারেন। ছাত্রদের স্বয়ংসঞ্চয়নেও উৎসাহিত করা যায়।

কবিতা মুখস্থ করায় সুপদ্ধতির প্রয়োগ না হ'লে সমস্ত ব্যাপারটা ছাত্রের পক্ষে কঠিন ও ভীতিজনক হয়ে পড়ে। সাধারণত কবিতার একেকটি ছত্র বহুবার উচ্চারণ করে' একেক ছত্র করে' মুখস্থ করা হয়, কিন্তু এ অভ্যাস গ্লানিকর এবং এতে মুখস্থ করা সহজ না হয়ে বরংচ ভ্রমের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আনন্দের সংগে সত্বর কবিতা মুখস্থ করতে হ'লে আবৃত্তিভংগীর সাহায্য নিতে হবে। কবিতাটির অর্থ বুঝে সমগ্রভাবে বার বার পড়ে' তাকে আয়ত্ত করতে হবে। এরূপ অভ্যাসে মুখস্থ করার ক্ষমতা ক্রমশ এমন বৃদ্ধি পায় যে ছাত্র কয়েকবার মাত্র আবৃত্তি করে' মুখস্থ করতে পারে।

আবৃত্তি ও অভিনয়ের নিকট সম্পর্ক। আবৃত্তিতে ভাবপ্রকাশের যে-সব পন্থা অবলম্বন করা হয় সেগুলি অভিনয়ধর্মী। অভিনয়ও শিশুশ্রেণীর প্রথম থেকে চলতে পারে। যে অতি ক্ষুদ্র শিশু ড্রাইভার, পুলিশ, সেপাই ইত্যাদি সেজে কল্পনার উৎস খুলে দেয়, সে যে শৃগাল সেজে দ্রাক্ষাফলের জন্য লাফাতে বা মৌমাছি সেজে নেচে নেচে মধুর সন্ধানে যেতে চাইবে তাতে সন্দেহ নেই। শিশুশিক্ষার প্রায় সকল পাঠকেই শিশুরা নিজেরা ছোট ছোট নাটিকায় রূপান্তরিত করতে পারে। এতে শিশুর পাঠ্য বুঝবার সহায়তা করে এবং সাহিত্যরচনা ও অভিনয় দুইকাজ একত্রিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ 'বনের কুকুর ও ঘরের কুকুর' বা 'মৃন্ময় কলসী ও পিতলের কলসীর' গল্প নেওয়া যেতে পারে। প্রথমে শিশু গল্পটি পাঠ্য-পুস্তকে পড়লো। পুনরালোচনার সময়ে শিক্ষক প্রশ্ন করে' শিশুদের কাছ থেকে তাদের ভাষায় কথোপকথনটি বলিয়ে নিয়ে নাট্যাকারে বোর্ডে লিখে

দিতে পারেন। তারপর পাত্রনির্বাচন। দুটি শিশুকে অভিনয় করার ভার দেওয়া হ'ল ; অন্যরা শুনবে ও পরে সমালোচনা করবে। প্রথম অভিনয় হয়ে গেলে বোর্ড মুছে দিয়ে অপর দুটি শিশুকে পুনরভিনয় করানো যেতে পারে। এতক্ষণে কথাগুলি তাদের এতটা অভ্যস্ত হয়ে যাবে যে বোর্ডে লেখা না থাকলেও তারা অনুরূপ ভাষায় কথা বলতে পারবে। শিক্ষক কণ্ঠস্থ করা অপেক্ষা মূল বিষয়ানুসারী মৌলিক প্রচেষ্টাকে বেশি উৎসাহ দেবেন। শেষে অভিনয় ও সমালোচনার সাহায্যে নাটকের অভ্যাস ও উৎকর্ষ সাধিত হ'লে শিশুরা খাতায় লিখতে পারে।

শ্রেণীতে এবং বিদ্যালয়ের উৎসবাদি উপলক্ষ্যে ছোট ছোট কবিতার অভিনয় সুন্দর হয়। "কোথা থেকে আসছ তুমি ছোট্ট মানুষটি" বা "ছোটখাট কৃষক আমি" প্রভৃতি নাট্যাকারে রচিত কবিতা সাজপোষাক নিয়ে অভিনয় করানো যায়। অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীতে রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনীর' অনেক কবিতার অভিনয় করানো যায়, তবে তার পন্থা অন্যরূপ। এ-গুলির রূপায়ণে আবৃত্তি ও অভিনয়ের মিশ্রণ ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, "নগরলক্ষ্মী" কবিতার অভিনয় করতে হ'লে বুদ্ধদেব, সুপ্রিয়া ও বিভিন্ন নাগরিকদের অংশগুলি বিভিন্ন ছাত্রকে দিতে হবে আর সাধারণ অংশগুলি (যেগুলি কারো উক্তি নয়) পড়বার জন্য একদল বালককে পৃথক করতে হবে। এই বালকের দল সাধারণ অংশগুলি সমস্বরে পড়তে থাকবে এবং ব্যক্তিবিশেষের উক্তিস্থলে থামবে, তখন যার যে উক্তি সেই অনুসারে তারা বলবে।

বিভিন্ন পাঠের অনুবন্ধের দ্বারাও অভিনয় হ'তে পারে। ইতিহাস ও সাহিত্যের অনুবন্ধ বেশ সফল হয়। হয়তো শ্রেণীতে বুদ্ধদেবের বিষয় পড়ান হচ্ছে, তখন সাহিত্যের শিক্ষক বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে গল্প ও কবিতা পড়াবেন। ঐতিহাসিক জ্ঞান ও সাহিত্যিক পরিবেশকে মিলিত করে'

ছাত্রেরা নাটিকা রচনা করে' অভিনয় করবে। উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা পরিপূর্ণ গ্রন্থ বা উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করে' অভিনয় করতে পারে। যথা, 'নিষ্কৃতি' বা ইংরেজি দ্রুতপাঠের গ্রন্থ 'শিবাজী'।

ছোট বড় কোনো ছাত্রই শ্রেণীকক্ষের মধ্যে অভিনয় করে' সন্তুষ্ট থাকবে না, সাজপোষাক পরে' দর্শকের সামনে অভিনয় করতে চাইবে। শ্রেণীর কাজের মধ্যে নাটকের রচনা ও অভ্যাস হ'লে পর কোনো ছুটির দিনে পরিপূর্ণ অভিনয়ের সুযোগ পেলে তারা আনন্দিত হবে। কোনো বৃহত্তর উৎসবের দিনে প্রত্যেক শ্রেণীকে তার শ্রেষ্ঠতম অবদানকে রূপায়িত করতে বলা যেতে পারে।

গল্প বলা মৌখিক কাজের একটি প্রধান অংগ। প্রথম প্রথম শিক্ষক গল্প বলবেন, শিশু শুনবে, ক্রমশঃ শিশুও গল্প বলবে। শিশুর প্রথম কথা পূর্ণবাক্যরূপ ধারণ করে না, শব্দ তখন তার প্রধান উপজীব্য, তারপর সে ধীরে ধীরে বাক্যভংগী আয়ত্ত করে। যখন সে বিদ্যালয়ে আসে তখনও দু'এক কথায় কাজ সারবার ইচ্ছা তার প্রবল থাকে। শিক্ষক তাকে বাক্য গঠন ও বাক্যপরম্পরা রচনা করতে শেখাবেন। ছবি দেখিয়ে গল্প বলান এর ভাল উপায়। যেমন, একটা ছবি দেখান হ'ল যাতে একটি ছোট মেয়ে আধখানা জিলিপি হাতে নিয়ে পুতুল কোলে করে' দাঁড়িয়ে আছে। ছবির বর্ণনা করা নীরস কাজ কিন্তু গল্প বলা আগ্রহজনক।

যা চোখে দেখা যাচ্ছে তার পুনরাবৃত্তি হবে এইরকম—"একজন মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে আধখানা জিলিপি আছে। তার কোলে একটি পুতুল আছে। পুতুলের জামা নীল। মেয়েটির শাড়ি লাল।"

তৎপরিবর্তে শিক্ষক যদি নিম্নলিখিত ধরণের প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে তার কল্পনাশক্তিকে জাগ্রত করতে পারেন তবে বিবরণটি সরস গল্পে পরিণত হবে। যথা,—

মেয়েটির নাম কি? ওকে পুতুলটা কে দিয়েছে? পুতুলের নাম কি? ও জিলিপি নিয়ে কি করছে? শুধু একা একা খাচ্ছে কি? জিলিপি ওর কেমন লাগছে?

শেষ পর্যন্ত প্রশ্নোত্তরসহায়ে এই রকম গল্প দাঁড়াতে পারে—"বীণা লক্ষ্মী হয়ে পড়াশোনা করছিল বলে' তার মা তাকে একটা পুতুল দিয়েছিল। সে পুতুলের নাম দিয়েছে 'সোনা'। বীণা আর সোনা দুজনেই জিলিপি খেতে ভালবাসে। তারা প্রায় জিলিপি খায়।"

গল্পটি বড়দের কাছে তত চিত্তাকর্ষক না হ'লেও ছোটরা এতেই আনন্দ পাবে। একটি মেয়ে বাঘ আর ঘোড়ার কথোপকথন নিয়ে এই গল্পটি বলেছিল "বাঘ রাস্তার ধারে বসেছিল। একটা ঘোড়া এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলো—"বাঘ তুমি আমার কাঁচি নিয়েছ?"—বাঘ বল্ল—"না, আমি তোমার কাঁচি নিইনি" ঘোড়া তখন রাগ করে বল্ল "তুমি কিচ্ছু জান না, খালি বসে বসে খাও আর ঘুমোও।"

এইভাবে প্রথমে চিত্র ও চিত্রপরম্পরা অবলম্বন করে' গল্প লিখে পরে ছবির অবলম্বন ছাড়া শিশু নিজের খেলার বিষয়ে, ব্যক্তিগত নানা অভিজ্ঞতার বিষয়ে গল্প রচনা করতে পারবে। শিক্ষকের কাছে শোনা এবং বইয়ে পড়া গল্পের পুনরাবৃত্তি করতেও তারা শিখবে।

গল্প বলার সময়ে কয়েকটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমত, ছোট ছেলেপিলেকে যেন লম্বা গল্প বলতে দেওয়া না হয়। লম্বা বক্তৃতায় বড়দেরও অনেক সময়ে খেই হারিয়ে যায়, ছোটদের তাই দিয়ে অনাবশ্যক বিড়ম্বিত করা বাঞ্ছনীয় নয়। নিচের ক্লাসের গল্পগুলি খুব সংক্ষিপ্ত হওয়া ভাল; প্রথম প্রথম কয়েকটি মাত্র বাক্যই যথেষ্ট, কেননা, পারম্পর্য রক্ষা করে' তার বেশি ধারণা করার সামর্থ্য শিশুচিত্তের থাকে না। তাছাড়া একজন অনেকক্ষণ বক্তৃতা দিলে শ্রেণীর অন্যান্য ছাত্রদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটার

সম্ভাবনা। এইজন্য লম্বা গল্প হ'লে শিক্ষক সেটি বলার কাজ শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন।

দ্বিতীয়ত, ছাত্র যখন গল্প শুনে বা পড়ে' গল্প বলবে তখন শিক্ষক যেন তাকে সেটি সম্পূর্ণরূপে নিজের ভাষায় বলতে বাধ্য না করেন। শিক্ষকের ভাষা বা বইয়ের শব্দ ব্যবহার করে ফেলা তার পক্ষে স্বাভাবিক, সেটা এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করলে গল্পের খেই হারিয়ে যাওয়া সম্ভব। তাছাড়া বইয়ের ভাষা সহজভাবে আত্মসাৎ করতে পারলে ভাল ছাড়া মন্দ হওয়ার কথা নয়। শিশু যদি বৃষ্টির সময়ে বলে—"টাপুরটুপুর বৃষ্টি পড়ছে" বা চিড়িয়াখানায় বাঘ দেখে বলে—"ওর গায়ে কালো কালো দাগ" তখন বুঝব যে ছড়ার বাক্য তার মুখে এসে তার প্রকাশভংগীকে সমৃদ্ধ করছে। শিক্ষককে শুধু এইটুকু দেখতে হবে যে ছাত্র যেন অর্থটা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করে আর ভাষাটা চেষ্টা করে' মুখস্থ না করে।

কর্মভিত্তি শিক্ষাপদ্ধতিতে কাজ অবলম্বনে আলাপ-আলোচনার দ্বারা সপ্রতিভভাবে কথা বলার অভ্যাস হয়। শ্রেণীর সামনে গৃহীত পরিকল্পনা ও কৃত কাজের বিবরণী দিয়ে ছাত্ররা ছোটখাট বক্তৃতা দিতে শেখে। কোন কোন বিদ্যালয়ে শ্রেণীর প্রথম কাজ হয় 'খবর বলা'। এতে আগ্রহজনক ঘটনাগুলি উৎসাহের সংগে বলা হয় এবং অনেক সময়ে দেয়ালপত্রীর মধ্যে নিবদ্ধ করা হয়।

তর্ক এবং আলোচনা মৌখিক কাজের রূপভেদ। অতি অল্প বয়সে যুক্তিতর্কের ক্ষমতার ভাল বিকাশ হয় না বলে অনেকে এই অভ্যাসকে নিচের শ্রেণীতে প্রযোজ্য বলে' মনে করেন না। কিন্তু নিচের শ্রেণীর শিশুরা যখন অন্যের ভাষা, উচ্চারণ বা কথা বলার ভুল ধরে' দেয় কিংবা কোন ছবি বা গল্পের উৎকর্ষাপকর্ষ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করে তখনই তারা সে বৃত্তির পরিচয় দেয়। কর্মভিত্তি শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুরা পারস্পরিক

সহযোগিতায় নানারূপ কার্যপরিকল্পনা প্রয়োগ করে' অতি অল্প বয়সেই আলাপ আলোচনার ক্ষমতা বিকশিত করে। যে সব বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সেখানে মন্ত্রি-নির্বাচন, শ্রেণি-শৃংখলারক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ের মধ্য দিয়ে শিশুদের আলোচনার অভ্যাস হয়। তারপর নিম্নমধ্য শ্রেণীগুলিতে এই প্রক্রিয়ার রীতিমত প্রয়োগ করাতে উচ্চশ্রেণীতে আলোচনা ও তর্কসভার ব্যবস্থা হ'তে পারে।

বিদ্যালয়ে আলোচনা বা তর্কসভার অনুষ্ঠান করতে হ'লে প্রবন্ধ রচনার মতই যত্ন নেওয়ার দরকার। প্রবন্ধ লেখাবার আগে যেমন বিষয়-বস্তুটি নানাভাবে, সবদিক থেকে আলোচনা করা হয়, আলোচনা ও তর্কের আগেও তেমনি করা চাই। কথাবার্তার মধ্য দিয়ে বিষয়টির সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হ'লে পর শিক্ষক ছাত্রদের বিদ্যালয়ের পাঠাগার থেকে বই বা বইয়ের অংশ পড়ে জ্ঞানবৃদ্ধি করার নির্দেশ দেবেন। আলোচনা বা তর্কসভার দিন যাতে পূর্বনির্ধারিত বক্তা ভিন্ন শ্রেণীর অন্য সকলে আলোচনায় যোগ দেয় সেদিকে শিক্ষক দৃষ্টি রাখবেন।

ক্লাসের পাঠের মধ্যে কোনো সমস্যাপূর্ণ বিষয় থাকলে সেটিকে অবলম্বন করে' তর্ক বা আলোচনা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ গ্রাম্যজীবনের বর্ণনা-মূলক কবিতা বা প্রবন্ধ পাঠের পর গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনের আপেক্ষিক উৎকর্ষাপকর্ষ সম্বন্ধে তর্ক এবং ওয়াজেদ আলির "ভারতের বৈশিষ্ট্য" পাঠের পর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক আলোচনা সফল হয়। বাইরের বিষয় নিয়ে আলোচনা বা তর্ক করাতে হ'লে, বিষয়টি যেন চিত্তাকর্ষক এবং ছাত্রদের অভিজ্ঞতার সংগে কোনো ভাবে জড়িত হয়।

তর্ক ও আলোচনার মধ্যে পদ্ধতিগত প্রভেদ আছে। তর্কের জন্য দুটি প্রধান ও দুটি অপ্রধান বক্তা নির্দেশ করে' দিতে হয়, তাদের বলা হয়ে গেলে অন্যরা যোগ দেবার অধিকার পায়। আলোচনায়

একজন বিষয়ের উত্থাপনকর্তা ও কয়েকজন প্রধান বক্তা নির্দিষ্ট থাকে। তর্কে বিষয়টির দুটি দিক দেখাতে হয় কিন্তু আলোচনায় নানাভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। তর্কে বক্তাদের দুইপক্ষের একটিকে অবলম্বন করতে হয়, আলোচনায় নিরপেক্ষ বক্তৃতার স্থান আছে। তর্কের নিয়ম আইনসভার নিয়মের অনুসারী, আলোচনার তেমন কড়া নিয়ম নেই।

উদারতা ও নিরপেক্ষতার দিক দিয়ে তর্কের চেয়ে আলোচনা বেশি বাঞ্ছনীয়; অপরপক্ষে তর্কে নিয়মানুযায়ী কাজ করার পদ্ধতির (formal procedure) অভ্যাস হয়। বস্তুত দুইই সমানভাবে ছাত্রের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনের উপযোগী।

বিশেষভাবে মৌখিক কাজ ছাড়া ক্লাসের সাধারণ পাঠের মধ্যে কথাবলার অভ্যাস হয়। এইজন্য প্রশ্নবহুল এবং কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির এত আদর। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে—"Little children should be seen and not heard." কোনো শিক্ষাবিদ এটিকে পরিবর্তিত করে' বলেছিলেন—"The class-teacher should be seen and not heard"—অতদূর অগ্রসর না হ'লেও বলা যায় যে নিজে কম কথা বলে' ছাত্রদের কাছ থেকে বেশি আদায় করতে পারাতেই শিক্ষকতার কৃতিত্ব।

পাঠ ও পাঠ্য

আলোচনার সুবিধার জন্য পড়া এবং লেখা এই দুই কাজের বিষয় পৃথক পরিচ্ছেদে নিবদ্ধ হ'ল, কিন্তু শিক্ষককে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে কাজদুটি অংগাংগিভাবে জড়িত এবং শিক্ষাক্ষেত্রে একসংগে পরিচালিত হয়। আরো মনে রাখতে হবে যে আধুনিকতম পদ্ধতিসমূহে পড়তে শেখার আগে লেখার যন্ত্রগুলি শিশুর হাতে দেওয়া হয়, অক্ষরকে অক্ষর বলে' চিনতে শেখার আগে সে তার আকৃতির সংগে পরিচিত হয় এবং সেই আকৃতি তার চিত্রাংকনপ্রচেষ্টার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। এই স্তরের লেখা সচেতনভাবে লেখার পর্যায়ে পড়েনা বলে' শিক্ষকতা-কার্যের জন্য লেখার সামান্য আগে পড়াকে স্থাপিত করা যায়। তাছাড়া পড়ার চেয়ে লেখার কাজ জটিল, কেননা পড়ার মধ্যে চোখের কাজ আর লেখায় চোখ আর হাতকে একযোগে কাজ করতে হয়।

আগেকার দিনের মত বর্ণপরিচয় ও অক্ষর মুখস্থ করার পথে পড়তে শেখার পদ্ধতি এখন অচল, সমগ্র বাক্য এবং শব্দ নিয়ে শিশুর পড়া আরম্ভ হয়। এর কারণ, প্রথমত, প্রাচীন পদ্ধতির মধ্যে আনন্দের স্থান ছিলনা, মেরে ধরে' অক্ষর মুখস্থ করানর মধ্যে যে ধরণের নীরস মজুরি আছে সেটা শিশুস্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। পড়তে দুষ্টমি বা অনিচ্ছা প্রকাশ করা এই পদ্ধতির ব্যবহারের ফল। শিশু যাতে আনন্দ পায় সেই কাজ করতে চায়, পড়তে শেখায় সে যদি প্রচুর আনন্দ পায় তবে সে মনোযোগ দিয়ে পড়বে এবং তার শিক্ষা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হবে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক বর্ণের সূক্ষ্ম কারিগরি

শিশুর অনভ্যস্ত চোখে ধরা পড়া অসম্ভব বলে' শব্দের সমগ্র রূপই তার পক্ষে চেনা সহজ হয়।

এই কারণে শিক্ষার পদ্ধতিও এখন বইয়ের মধ্যে আবদ্ধ নয়। কাজ বা খেলার মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ করলে শিশুর নিজের ক্রিয়া-কলাপই তার মনে পড়ার সহজ তাগিদের সৃষ্টি করে। যথা, ডাকঘর বা দোকানের খেলায়, কিংবা বাগানের কাজের হিসাবে, যে শিশু পড়তে জানে তার সুবিধা দেখে আর সকলেও পড়া শিখতে চায়। তা-ছাড়া বিদ্যালয়ের দৈনিক কার্যসূচিতে পড়াশোনার আরো নানা প্রয়োজন সৃষ্টি করা যায়। যেমন, প্রত্যেক শিশুর বসার ও জিনিষপত্র রাখার জায়গায় নাম লেখা থাকলে সে নিজের নাম পড়তে শিখবে। তারপর প্রত্যেকদিন শ্রেণীতে মাস, বার, তারিখ টাঙিয়ে দেবার ব্যবস্থা থাকলে সেই কাজের "পালা" পাবার লোভে শিশু সেগুলি পড়তে শিখবে।

তা-ছাড়া ছবি ও জিনিষের সাহায্যে পড়তে শেখান যায়। শিশু যা ভালবাসে সেইসব জিনিষ বা তার ছবি দেখিয়ে তার সঙ্গে স্পষ্ট করে' লেখা তার নাম দেখাতে হয়ঃ এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির পর শিশু নাম-লেখা কার্ড দেখেই লিখিত শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। এই পদ্ধতি অভ্যাসের (conditioning) ভিত্তিতে স্থাপিত। এর ব্যবহারের জন্য শিক্ষক উজ্জ্বল, সুন্দর জিনিষ ও ছবি সংগ্রহ করে' রাখবেন এবং সেগুলির নাম লেখা মজবুত কার্ড তৈরি করবেন। পড়তে শেখা হয়েছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য জিনিষ ও ছবি আলাদা গোছায় রেখে মিলিয়ে দিতে বলা যায়। তাতে খেলা আর পড়া একসংগে হয়।

শিশু ক্রমশ সমগ্র বাক্য শিখবে। ক্লাসের নির্দিষ্ট স্থানে স্পষ্ট অক্ষরে নানা বিজ্ঞপ্তি লিখে টাঙিয়ে রাখলে সেগুলি বুঝবার জন্য পড়তে

শেখার উৎসাহ হবে। যেমন, বাজে কাগজের ঝুড়ির কাছে লিখে রাখা যায়—"এখানে বাজে কাগজ ফেল"—দরজার গায়ে লেখা যায়—"দরজা বন্ধ কর"—ইত্যাদি। নিচু ক্লাসে ছবি ও লেখা মিলিয়ে নোটিস দেওয়ার পদ্ধতি ভাল, যেমন, কোনো খেলার নোটিসে সেই খেলার ছবি দেওয়া যায়, যদি খাওয়াদাওয়ার ব্যাপার থাকে তবে ভোজের ছবি দেওয়া যায়। ক্রমশ শিশু ছবির সাহায্য ছাড়াই নোটিসের অর্থ বুঝতে শিখবে।

পড়তে শেখার জন্য sight cardsএর ব্যবহার করা যায়। লম্বা কার্ডবোর্ডের টুকরোর কাজের বর্ণনা বা হুকুম লেখা থাকে, শিশুদের সামনে সেগুলি একে একে তুলে ধরলে তারা সেই অনুসারে কাজ করে। যেমন, কার্ডে যদি "আমরা এমনি করে' ঘোড়ায় চড়ি", "আমরা এমনি করে' নৌকা চালাই" ইত্যাদি কাজের উল্লেখ থাকে তবে শিশুরা সেগুলি দেখে তার অভিনয় করে। কার্ডে যদি "উঠে দাঁড়াও"—"বোসো"—"দরজা খোলো"—"দরজা বন্ধ কর"—প্রভৃতি নির্দেশ লেখা থাকে তবে তারা তা পালন করে। কার্ডে যদি প্রশ্ন লেখা থাকে তো শিশু মুখে তার উত্তর দেয়। এতে খেলা ও পড়ার সংগে অভিনয়ের আনন্দ মিলে যায়। কার্ডগুলিকে দুই অংশে ভাগ করে' মিলিয়ে নিতে বলে' শিক্ষার পরীক্ষা করা যায়।

এই পদ্ধতি ব্যবহার করার সময়ে শিক্ষককে সতর্ক থাকতে হবে। সাবধানতা অবলম্বন না করলে অনুকরণের অভ্যাস হ'তে পারে। বুদ্ধিমান শিশুরা অর্থ বুঝে কাজ করে কিন্তু অন্যরা তাদের দিকে চেয়ে অনুকরণ করে' পার পেতে চায়।

বাংলাভাষায় ফলা ও যুক্তাক্ষরের ব্যবহারকে অনেকে স্বাভাবিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগের অন্তরায়স্বরূপ মনে করেন। যুক্তাক্ষরবর্জিত

শিশুসাহিত্য রচনার চেষ্টা হয়েছে বটে, কিন্তু তার অসুবিধা এই যে শিশুর পরিচিত, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত যে সব বস্তু, মানুষ ও ভাব এই পদ্ধতির ভিত্তি সে সবের যুক্তাক্ষরবর্জিত নাম খুঁজে পাওয়া কঠিন এবং পাওয়া গেলেও সাধারণভাবে ব্যবহৃত যুক্তাক্ষরসমন্বিত শব্দের ব্যবহারই শিশুর পক্ষে বেশি সহজ হয়। এ-বিষয়ে মধ্যপথ অবলম্বন করা ভাল, অর্থাৎ যুক্তাক্ষরাদি এড়িয়ে চলা হবে কিন্তু ভাষা ও ভাবের অস্বাভাবিকতা সম্পাদন করে' সেগুলি বর্জন করা হবে না। এইরূপ নির্বাচন ও সংমিশ্রণের চমৎকার উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের "সহজপাঠ"।

শিশু যেমন একদিকে বিবিধ কার্যিক প্রয়োগ ও ব্যবহারের দ্বারা ভাষা-যন্ত্র আয়ত্ত করবে অন্যদিকে তেমনি সংগে সংগে সাহিত্যচর্চাও চলবে। কোনো কোনো আধুনিক শিক্ষাবিদ বলেন যে শিশুর সাহিত্যপাঠের প্রয়োজন নেই, কিন্তু রসবোধের বিকাশ বিনা মনোগঠন ও ভাবসমৃদ্ধি-সাধন সম্ভবপর হয় না বলে' শিশুকে প্রথম থেকে সাহিত্যের সম্মুখীন করতে হবে। ছড়া ও গল্প শিশুর প্রথম সাহিত্য। পড়তে শেখার আগে গল্প শোনা ও আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে এগুলির সংগে পরিচয় সাধিত হয়। পড়ার কিছু অভ্যাস হ'লে উজ্জ্বল ছবি ও বড় হরফ-ওয়ালা ছোট ছোট বই পড়তে দিতে হয়। শিক্ষক যদি বড় বড় ছবি এঁকে তার নিচে দু'এক ছত্র করে' কবিতা বা গল্প লিখে দেয়ালপত্রের (poster) মত টাঙিয়ে রাখেন তবে সেগুলি সব সময়ে শিশুদের সামনে থেকে প্রভাব বিস্তার করে।

অপেক্ষাকৃত অগ্রসরশীল ছেলেরা লিখবার অভ্যাস করতে যে সব ছবি ও গল্পের বই তৈরি করে, সেই বই এদের পড়তে দিলে ছবি ও গল্প মিলিয়ে পড়া খুব আনন্দজনক হবে। তাছাড়া, এরোপ্লেন, মোটর, রেলগাড়ি, পাখী, ফুল, ফল, জীবজন্তু প্রভৃতির বিষয়ের ছবির বই থেকে শিশুরা যে-যার রুচি অনুযায়ী পড়ার খোরাক সংগ্রহ করবে। এগুলি রাখার নির্দিষ্ট জায়গা

থাকবে, শিশুরা ইচ্ছামত নিয়ে পড়ে' আবার তুলে রেখে দেবে। শিশুশ্রেণী আর বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পৃথক বইয়ের আলমারি থাকলে শিশুরা নিজেরাই ওই "গ্রন্থাগারের" পরিচালনা করবে এবং স্বাধীনভাবে পড়াশোনা করে' আনন্দ লাভ করবে। ছাপা বই কেনবার সময়ে এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে শিশুরা শিক্ষকের সামান্য সাহায্যেই সেগুলি পড়তে ও বুঝতে পারে।

ব্যাবহারিক ভাষাশিক্ষা ও স্বাধীন সাহিত্য পাঠ মিলিয়ে "পুস্তকহীন" শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন হয়েছে। এতে শিশুশ্রেণী এবং বিদ্যালয়ের প্রথম দুই শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট বাংলার পাঠ্যপুস্তক থাকে না, বহুকথন ও ভূয়োলিখনের দ্বারা কার্যক্ষেত্রে ভাষাজ্ঞান আয়ত্ত হয় আর ছোট গ্রন্থশালায় বহুপঠনে জ্ঞান আহরণ ও রসোপভোগ হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর পূর্বে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু নিতান্তই কোন বই নির্দিষ্ট করতে হ'লে প্রচ্ছদপট, ছবি, ছাপা, বাঁধাইয়ের সংগে বিষয়বস্তুর উপযোগিতার দিকে দৃষ্টি রেখে নির্বাচন করতে হবে। শিক্ষক যদি একটি বইয়ে আবদ্ধ না থেকে, বিভিন্ন বইয়ের শ্রেষ্ঠ উপাদান সঞ্চয় করে' "পুস্তকহীন" প্রণালীতে শিক্ষা দেন তবে ব্যাবহারিক ও সাহিত্যিক শিক্ষার মধ্যে কিছুটা সমন্বয় সাধিত হয়।

তৃতীয় শ্রেণী থেকে ছাত্র পাঠ্যপুস্তকের ধরাবাঁধা পাঠের অধীন হয়। বাংলা পড়ার বইয়ে কবিতা ও গল্প ছাড়া নানা প্রকারের জ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধও সংকলিত হয়। সেগুলির সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার উপযোগী ভাষাজ্ঞান ও শব্দসম্ভার আয়ত্ত করে' মাতৃভাষার মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা লাভের সুবিধা হয়।

তাছাড়া এতে অন্যান্য শ্রেণীর পাঠের সংগে বাংলা পড়ার অনুবন্ধ স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়ে সাধারণত যে সব পাঠ্যপুস্তক পড়ান হয় তার

মধ্যে এর বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। 'কিশলয়ে' এমন কতকগুলি পাঠ আছে যার সংগে পরিবেশপরিচিতি, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির কথা, প্রকৃতি পাঠ প্রভৃতির অনুবন্ধ হয়। অন্য বইয়ে 'দার্জিলিং' প্রবন্ধ পড়ানোর সময়ে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সংস্থানের বিষয়ে বলা যায়; ঋতুবর্ণন পাঠ্য হ'লে প্রকৃতিপাঠের সংগে যুক্ত করা যায়; 'বিমানপোত' প্রবন্ধ অবলম্বন করে' এরোপ্লেনের উন্নতি ও পরিণতির আলোচনা হয়; 'সেকেন্দ্রা' কবিতায় ইতিহাস ও ভূগোলের মিলনের সুযোগ পাওয়া যায়।

তথাচ সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তকের সহায়তায় ছাত্রকে বাংলা সাহিত্যের সংগে পরিচিত করে' দেওয়া সাহিত্যপাঠের মূল উদ্দেশ্য। সুখের বিষয় আধুনিক সাহিত্যসংকলনগুলিতে উৎকৃষ্ট সাহিত্যাংশের উদ্ধৃতি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু মাতৃভাষার সাহিত্যের সেইটুকু পরিচয় যথেষ্ট নয়। বাংলার শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে বইখানা পাঠের পথনির্দেশকমাত্র এবং বইকে দ্বারস্বরূপ গ্রহণ করে' বিরাট সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশই শিক্ষকতার আসল লক্ষ্য। আজকের ছাত্রেরা যে পড়া করে তার সংক্ষিপ্তসার খোঁজে নোট বইয়ে, কিন্তু তাদের মধ্যে এই বোধ জাগ্রত করতে হবে যে পাঠ্য-পুস্তক তাদের নোট বা সংক্ষিপ্তসার, আসল পড়ার বিস্তার তার চেয়ে অনেক বেশি।

পাঠ্যপুস্তকনির্বাচনের সময়ে তার চিত্তাকর্ষকতা ও সরসতার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। অনেক শিক্ষক পড়ার বইয়ের চিত্তাকর্ষক হওয়া পছন্দ করেন না, কেননা, তাহ'লে ছাত্ররা আগেই বইটি শেষ করে' রাখবে, তাঁর পড়াবার কিছু থাকবে না, তারা ক্লাসে মনোযোগ দেবে না। এই যুক্তি সমীচীন নয়, কারণ যে বই পড়তে ভাল লাগে সে বই দু'বার কেন, দশবার পড়বারও আগ্রহ থাকে। তাছাড়া শিক্ষকতার ওপরও ছাত্রের মনোযোগ অনেকাংশে নির্ভর করে; শিক্ষক যদি ক্লাসের পড়াকে ব্যাখ্যা ও শব্দার্থের

সংকীর্ণ পথে নিয়ে চলেন তবে, বস্তু যতই নোতুন হোক না কেন, ভালো লাগবে না। অথচ বহু পরিচিত, পঠিত, পুরাতন বইকেও সাহিত্যালোচনার উদার ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করে' দিলে ছাত্রের উৎসাহপূর্ণ সহযোগিতা আকর্ষণ করা যায়।

সাহিত্যশিক্ষককে ব্যাখ্যা, শব্দার্থ বা ব্যাকরণের দীর্ঘ আলোচনা এড়িয়ে চলতে হবে। ওই বিশ্লেষণ বোধের পরিপন্থী। অনেক শিক্ষক কবিতা পড়াবার সময়েও রসোপভোগের প্রাক্কালে কঠিন শব্দার্থের উল্লেখ না করে' থাকতে পারেন না। শব্দার্থশিক্ষার প্রয়োজন স্বীকার্য, কিন্তু সাহিত্যপাঠের মধ্যে সে বাহ্য। নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন এ ক্ষেত্রে তার প্রবেশ নিষেধ। অনেকে "এ ছত্রে অমুক অর্থবোধক কি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ?" বা "অমুক শব্দের প্রতিশব্দ কি কি ?" প্রভৃতি প্রশ্নের দ্বারা আভিধানিক বিচারকে খিড়কির দরজা দিয়ে পার করতে চান ; কিন্তু সে-ও শব্দার্থভিত্তি নীরস পাঠের রূপভেদমাত্র। অনুরূপ কারণেই শিক্ষক পাঠের শেষে 'সারমর্ম' লিখে বা লিখিয়ে সাহিত্যবোধের হানি করবেন না।

পাঠ্যপুস্তকের সংগে দ্রুতপাঠপুস্তকের প্রচলন আছে ; কিন্তু একটিমাত্র অতিরিক্ত পুস্তকের দ্বারা দ্রুত পাঠের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হ'তে পারে না। পঞ্চম শ্রেণীতে প্রথম একটি দ্রুত পাঠের বই দিয়ে ক্রমশ সংখ্যা বৃদ্ধি করে' শেষ পর্যন্ত তিন চারটি বই দিলে সাহিত্যাস্বাদের সহায়তা হ'তে পারে।

এতে সিলেবাস বাড়বে নিশ্চয়, কিন্তু এই বইগুলোও যদি পাঠ্যপুস্তকের মত টীকাটিপ্পনীসহকারে সর্বনাশা পদ্ধতিতে পড়ানো না হয় তবে তাতে হানি ঘটবে না কিছু। বহুপঠনে অভ্যস্ত সাহিত্যরসগ্রাহী ছাত্র বইয়ের বোঝা বইতে অপারগ হয় না, অপারগ হয় তারা, যারা মুখস্থবিদ্যার ভারবাহী।

সাহিত্যপুস্তক পাঠের উদ্দেশ্য তার বৈয়াকরণিক ও আভিধানিক বিশ্লেষণ নয়, সাধারণ অর্থবোধে রসোপলব্ধি করা। বড়রাও যে সব সময়ে

সব বইয়ের প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ খুঁটিয়ে বুঝতে পারেন এমন ধারণা যুক্তি-সংগত নয়। অথচ তাতে সমগ্র বইয়ের উপভোগের বাধা ঘটে না। বিদ্যালয়ের সাহিত্যপাঠকেও সেই পথে চালিত করতে হবে। ছাত্রেরা পড়বে, অর্থবোধের অসুবিধা হ'লে শিক্ষক সাহায্য করবেন। ছাত্র সব সময়ে নিজের অসুবিধা বুঝতে পারে না, নিপুণ শিক্ষক প্রশ্নের দ্বারা তার বোধের পরিমাপ করে' উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। পাঠারম্ভের পূর্বেও বিষয়-বস্তুর কিছু সংকেত দিয়ে দিলে অর্থবোধের সুবিধা হয়।

সাহিত্যবোধ জাগ্রত করা কঠিন কাজ। আলোচনার সাহায্যে এই বোধ মার্জিত করতে হয়, কিন্তু বোধের তারতম্যানুযায়ী আলোচনা ক্ষেত্র-বিশেষে অদ্ভুত ফল দান করে। একবার একটি ছোট মেয়েকে শরৎচন্দ্রের "মহেশ" পড়ে' হাসতে দেখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিয়েছিল "কি অদ্ভুত সব গালাগালি রয়েছে!" এরকম সংকটময় পরিস্থিতিতে শিক্ষককে বহুবার পড়তে হবে এবং ধৈর্যের সংগে সেগুলি অতিক্রম করতে হবে। অপরপক্ষে রসগ্রাহী ছাত্রছাত্রীর সহৃদয় সাহিত্যবোধ তাঁকে পুরস্কৃত করবে।

দ্রুতপাঠের বইয়ের নির্বাচনের সময়ে দেখতে হবে যে ক্লাসের পাঠ্য-পুস্তকের চেয়ে সেটি যেন সহজ হয়, কেননা কঠিন ভাষা ও ভাবের বিশ্লেষণ নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে হ'লে দ্রুতপাঠের মূল উদ্দেশ্য পরাজিত হবে।

বইয়ের বিষয়নির্বাচনে মনোবিকাশের স্তর, রুচি ও সাহিত্যবোধ, এই তিন দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বইগুলি যেন ছাত্রের বুদ্ধিবিদ্যার উপযোগী, চিত্তাকর্ষক ও সাহিত্যিক মূল্যসমন্বিত হয়। বালক ও কিশোরদের বইয়ে উদ্যম চাই, কাহিনীর দ্রুততা চাই, কৌতূহল ও প্রাণশক্তির খোরাক চাই। উজ্জ্বল বর্ণনাসমন্বিত আবিষ্কার, সাহসিকতা বা ঐতিহাসিক কাহিনী এদের ভাল লাগে। আজকাল অনেক সাধারণ জ্ঞানের বই, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের

জীবনকাহিনী, বংকিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের বালোপযোগী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, দ্রুতপাঠ পুস্তকের নির্বাচনে অসুবিধা নেই।

সর্বশেষ কথা এই যে উচ্চতম শ্রেণীতে সাহিত্যবোধ সম্পূর্ণ করতে হ'লে সাহিত্যের ইতিহাসের সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া দরকার। আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে তার কোন ব্যবস্থা নেই। স্কুলফাইন্যাল পরীক্ষার বাংলা পাঠসংকলনের অংশগুলি ইতিহাসের ধারানুযায়ী সজ্জিত আছে; সেগুলিকে সংযুক্ত করে' সরস ও সুন্দর ঐতিহাসিক বিবরণপাঠের ব্যবস্থার নিতান্ত প্রয়োজন।

পাঠাভ্যাস ও উচ্চারণশুদ্ধি

পড়া দুইরকমের, চেঁচিয়ে উচ্চারণ করে' পড়া আর মনে মনে পড়া, সরব ও নীরব পাঠ।

সরবপাঠ শিল্পবিশেষ। যে ভাল করে' পড়তে পারে তার পাঠ শুনতে সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই ভালবাসেন। এই সুন্দর অভ্যাস শিশুকে ছোটবেলা থেকে করাতে হবে। বুদ্ধিমান শিশু যখন অর্থ বুঝে চেঁচিয়ে পড়বে তখন তার পাঠ এত পরিষ্কার হওয়া চাই যাতে শ্রবণমাত্র অর্থবোধ হয়, এত সহানুভূতির সংগে পড়া চাই যাতে ভাবের সূক্ষ্ম তারতম্য তার কণ্ঠস্বর প্রকাশ করতে পারে এবং গদ্য বা পদ্যের তালেতালে তার কণ্ঠস্বরের সংগীতের মত মাধুর্যের সংগে ওঠানামা করা চাই। আদর্শপাঠের লক্ষণ এই তিনটি—প্রাঞ্জলতা, সহানুভূতি ও মাধুর্য। কবিতার ক্ষেত্রেই সরব পাঠের উপযোগিতা অধিক, কেননা বর্ণের পর বর্ণ, বাক্যের পর বাক্য সংযোজিত হয়ে যে সম্মিলিত ধ্বনির সৃষ্টি হয় চেঁচিয়ে না পড়লে তার মাধুর্য উপভোগ করা কঠিন।

চেঁচিয়ে পড়ার প্রথম উদ্দেশ্য ভাষার অর্থ পরিষ্কার করে' বোঝা এবং তারপর গদ্য বা পদ্যের ছন্দোমাধুর্য অনুভব করে' অপরকে করান। এইজন্য শিক্ষক প্রত্যেক পাঠের আগে নিজে আদর্শপাঠ শুনিয়ে ছাত্রদের তদনুযায়ী সরব পাঠে প্রবৃত্ত করবেন। এই উদ্দেশ্য সফল করতে হ'লে শিক্ষকের পাঠ ও উচ্চারণের ভংগী উৎকৃষ্ট হওয়া চাই। উচ্চারণ ও স্বরনিয়ন্ত্রণশিক্ষা আধুনিক শিক্ষণশিক্ষার অপরিহার্য অংগ হওয়া উচিত।

শিশুশ্রেণীতে ছোট ছোট বাক্য একসংগে বলিয়ে শিশুদের উচ্চারণ-শুদ্ধি করার প্রথা প্রচলিত আছে। উচ্চারণশুদ্ধি এই সময়ের সরবপাঠের

একটি উদ্দেশ্য। ছোট শিশুরা যখন প্রথম বিদ্যালয়ে আসে তখন তাদের মধ্যে অনেকেরই স্পষ্ট উচ্চারণ করার অভ্যাস থাকেনা এবং অনেকে নানারকমের উচ্চারণবিকৃতিও নিয়ে আসে। বয়সের অল্পতাজনিত অনভ্যাসের ফলে শিশুর উচ্চারণের যে-সব দোষ থাকে সেগুলির সংশোধন শিক্ষকের আদর্শানুযায়ী আপনিই হয়ে যায়, কিন্তু সত্যকারের বিকৃতির সংশোধন কঠিন।

বিভিন্ন পরিবারের, সমাজের বিভিন্ন স্তরের এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিশুদের পরিবার, সামাজিক পরিবেশ, ও প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ প্রকারের উচ্চারণবিকৃতি ঘটে থাকে। নিচে তার মধ্যে প্রধান কয়েকটির নমুনা দেওয়া হ'ল—

—শ-এর (sh) জায়গায় স-এর s উচ্চারণ, যথা "সিখীসহ সিখিনী সুখিনী"

—শ ও ষ-এর জায়গায় হ-এর উচ্চারণ, যেমন শালা=হালা, পাটি=হাটি।

—র-এর জায়গায় ড়-এর এবং ড়-এর জায়গায় র-এর উচ্চারণ, যথা—"ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বাড়ে বাড়ে,
দয়াহীন সংসাড়ে।"

অথবা—"তোমার বারি কোথায় ?

—র ও অ-এর বিপর্যয়, যথা—"আমবাবু রাম খান।"

—ল ও ন-এর বিপর্যয়, যথা—নাউ, লৌকা ইত্যাদি।

—ঘোষবৎ বর্ণের জায়গায় অঘোষ বর্ণের উচ্চারণ, যথা মাজখানে (মাঝখানে), লাটি (লাঠি)।

উপরিউক্ত কারণেই উচ্চারণ ছাড়া প্রকাশভংগীরও ভিন্নতা দেখা যায়।

বালকবালিকার বদ অভ্যাস, শারীরিক গঠন ও উচ্চারণযন্ত্রের দোষজনিত উচ্চারণবিকৃতিও অনেক সময়ে ঘটে। যেমন তোৎলামি, নাকে কথা বলা, খুব জোরে নিঃশ্বাস নেওয়া, ক্রমাগত নাকটানা, টেনে সুর করে' কথা বলা, অর্ধ-উচ্চারিতভাবে অতি দ্রুত কথা বলা ইত্যাদি। সামান্য বধিরতা অথবা অমনোযোগিতার দরুণ শিশু যদি সম্পূর্ণ শব্দ ভাল করে' শুনতে না পায় তা হ'লেও উচ্চারণের ভুল ঘটে' থাকে।

এরমধ্যে যেগুলি বদ অভ্যাস থেকে উদ্ভূত সেগুলি সহজে শোধরান যায়। শারীরিক বিকৃতির জন্য বিশেষ চিকিৎসা এবং ব্যবস্থার দরকার, সেগুলির আলোচনা প্রস্তুতের বহির্ভূত; কিন্তু তার ওপর শিক্ষকের সহানুভূতিপূর্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা চাই।

একবার শিক্ষকতার পরিদর্শনের সময়ে এরূপ একটি বিকৃতির উদাহরণ আমার চোখে পড়েছিল। একটি মেয়ের সরব পাঠের ও কথাবলার সময়ে প্রত্যেকটি শব্দের উচ্চারণের সংগে সশব্দে নিঃশ্বাস নেওয়ার অভ্যাস ছিল, তাতে তার পাঠ অবোধ্য হয়ে পড়ত। পরপর দু'দিন এই ক্লাসের পড়ানো পরিদর্শন করেছিলাম। প্রথমদিন যে ছাত্রশিক্ষয়িত্রী পড়াচ্ছিলেন তিনি বালিকার পাঠের ধরন দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন এবং সেই অবসরে ক্লাসের ভারপ্রাপ্তা শিক্ষয়িত্রী ও অন্যান্য ছাত্রীরা তাঁকে জানিয়ে দিল যে ওই মেয়েটি তোৎলা এবং কোনদিন পড়া পারেনা; ছাত্রশিক্ষয়িত্রী তৎক্ষণাৎ মেয়েটিকে বসতে বললেন ও সমস্ত ঘণ্টা তাকে সযত্নে এড়িয়ে চললেন। এতে পাঠবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে দু'টি দোষ ঘটল; ক্লাসের অন্যান্য ছাত্রীদের পরামর্শে কোন বিশেষ ছাত্রীসম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রথম এবং একটি বালিকাকে পাঠের অংশ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা দ্বিতীয় দোষ। কিন্তু

তদুপরি যে অন্যায় ঘটল সেটা অনেক গুরুতর, একটি বিকাশোন্মুখ মনের উন্মেষের পথে বাধা দেওয়া হ'ল।

দ্বিতীয় দিন ওই ক্লাসে অপর একটি ছাত্রশিক্ষয়িত্রী পড়াচ্ছিলেন। সেই মেয়েটি পড়তে আরম্ভ করামাত্র আগের দিনের মতই শিক্ষয়িত্রী ও অন্যান্য ছাত্রীদের কলরব উঠল, কিন্তু এই ছাত্রশিক্ষয়িত্রী মুহূর্তের মধ্যে গোলমাল থামিয়ে সহানুভূতির সংগে মেয়েটির পাঠবিকৃতি শোধরাতে উদ্যত হ'লেন এবং দু'একবারের চেষ্টাতেই সে প্রায় স্বাভাবিকভাবে পড়তে পারল। শিক্ষকতার সময়ে তিনি ওই মেয়েটিকে অন্য মেয়েদের সংগে প্রশ্নের সমান অংশ বণ্টন করে' দিলেন এবং সেও পরম উৎসাহে উত্তর দেবার চেষ্টা করতে লাগল। উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর হাতে পড়লে এই মেয়েটি যে অল্পকালের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

উচ্চারণশোধনের সময়ে শিক্ষকের বাংলা উচ্চারণের প্রকৃতিসম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হয়। বাংলা উচ্চারণের বিশেষত্ব এই যে প্রথমত এ স্বরের হ্রস্বদীর্ঘতার ওপর নির্ভর করেনা, স্বরাঘাতের তীব্রতা ও ক্ষীণতার ওপর নির্ভর করে; দ্বিতীয়ত বাংলায় প্রতি শব্দের প্রথম অক্ষরে প্রধান স্বরাঘাত পড়ে এবং তৃতীয়ত ব্যঞ্জনবর্ণের বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণই বাংলা উচ্চারণের প্রাণ।

সংশোধনের বহু পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সে-গুলির সাফল্যের একমাত্র ভিত্তি সহানুভূতি, এ ভিন্ন উপায় নেই। সরব পাঠের সময়ে যে বিকৃতি ধরা পড়ে অভ্যাসের দ্বারা তার সংশোধন করা হয়। সেই সময়ে শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে ছাত্রের পাঠে বিকৃতি থাকলে সে লাজুক ও ভীরু হয়ে থাকে; কাজেই, সংশোধন করতে গিয়ে যেন কোনরকমে সমগ্র ক্লাসের সকৌতুক দৃষ্টি তার ওপর না পড়ে।

তাহ'লে লজ্জা ও সংকোচের চাপে তার উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। এইজন্য সমস্বরে সরব পাঠের ব্যবহারের উপযোগিতা আছে।

এইরূপ পাঠাভ্যাসের কয়েকটি উদ্দেশ্য আছে। প্রথমত, একজনের উচ্চারণশুদ্ধির জন্য সবাইকে সমস্বরে পড়তে বললে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ না করে', অন্যদের সময় নষ্ট না করে', শিক্ষকের পরিচালনের গুণে সে কাজ সম্পন্ন হ'তে পারে। দ্বিতীয়ত, সবাইকে একসংগে পড়তে হ'লে তাল রেখে পড়তে হবে, তাতে ভাষার অন্তর্নিহিত ছন্দের পরিচয়লাভ সহজ হবে ও আদর্শ সরব পাঠের ভিত্তি স্থাপিত হবে। সর্বশেষ কথা এই যে নিচের শ্রেণীর ছেলেপিলেরা সমস্বরে চেঁচিয়ে পড়তে আনন্দ পায়।

সমস্বরে পাঠের বিপদ এই যে এতে গোলে হরিবোল দেওয়া সহজ, সেই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। তাছাড়া ভাষার তাল রক্ষা করতে গিয়ে অনেক সময়ে কৃত্রিমভাবে, সুর করে পড়ার অভ্যাস হয়—সেটা এড়িয়ে চলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে সমস্বরে সরব পাঠের জন্য এমন কবিতা নির্বাচিত করতে হবে যার মধ্যে ছন্দের বিভাগ সমান ও তাল সুস্পষ্ট।

ক্লাসের সবাইকে একসংগে চেঁচিয়ে পড়তে না দিয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ করে' এক-এক দলকে আলাদা করে' পড়ালে দলবদ্ধ পাঠের দোষ বর্জন করে' উপকারিতাটুকু রাখা যায়। এইরূপ পাঠের জন্য প্রশ্নোত্তর বা কথোপকথনের মত কোন নাটকীয় রীতি অবলম্বন করলে ছাত্রেরা বিশেষ আনন্দিত হয়। অভিনয়ের ব্যবহারও এরূপ ক্ষেত্রে উপযোগী।

এভিন্ন ক্লাসের সকলে যখন সাধারণভাবে কোনো কাজে ব্যাপৃত থাকে তখন শিক্ষক যদি এক-এক জনকে কাছে ডেকে, নিম্নস্বরে কথাবার্তা বলে' ব্যক্তিগতভাবে উচ্চারণসংশোধনের চেষ্টা করেন তবে যে ছাত্রের উচ্চারণ বিকৃত তার প্রতি কারো দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হবে না।

একা এবং সমস্বরে এই দুই রকম সরব পাঠ মিলিয়ে মিশিয়ে অভ্যাস করান ভাল। এর একটা ক্রম অনুসরণ করা যায়। নিচের ক্লাসে যখন ছোট ছোট বাক্য ও ছড়া পড়ান হয় তখন সমস্বরে সরব পাঠ উপকারী ও আনন্দদায়ক। ক্রমে ছাত্র যত অবিরল ও বিশুদ্ধভাবে পড়তে অভ্যস্ত হবে তত সমস্বরে পাঠ কমিয়ে একা পড়ার অভ্যাস করাতে হবে। উপরের ক্লাসে সমস্বরে পাঠ মোটামুটিভাবে বর্জন করা যায়।

উঁচু ক্লাসে কবিতা ছাড়া সরবপাঠেরও ব্যবহার কমিয়ে দেওয়া ভাল। বড়রা যখন পড়েন তখন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া প্রায় কখন চেঁচিয়ে পড়েন না, নীরব পাঠই পাঠের পূর্ণ পরিণতি এবং সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির দিনেও বাংলাদেশের অনেক বিদ্যালয়ে বানান করে' পড়তে শেখানর পদ্ধতি প্রচলিত আছে এবং তার ফলে অনেকেরই বানান করে পড়ার অভ্যাস থেকে যায়। এমন ছাত্রও দেখা যায় যে বড় হয়েও সে চেঁচিয়ে না পড়লে কোন বিশেষ পাঠাংশের অর্থ ভাল করে' বুঝতে পারে না এবং পড়া শিখতে পারে না। এদের নীরব পাঠ অনেক সময়ে সরবপাঠের রূপান্তরমাত্র—পড়ার সময়ে শব্দ না হ'লেও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ঠোঁট নড়ছে।

বানান করে' পড়তে যে অনেক বেশি সময় লাগে তা বলা বাহুল্য এবং সাধারণ সরব পাঠেও প্রত্যেকটি অক্ষর ঠোঁট, জিভ ইত্যাদির সাহায্যে পৃথক উচ্চারণ করতে হয় বলে' নীরবপাঠের চেয়ে বেশি সময় লাগে। তা ছাড়া সরবপাঠে অক্ষরগুলি একে একে পড়তে হয় বলে' পাঠ্যবস্তুটিকে সমগ্র ভাবে দেখা যায় না।

এই দুই দিক দিয়ে নীরব পাঠের উৎকর্ষ অস্বীকার করা যায় না। বিশেষত ওপরের শ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা ও কাঠিন্য যখন বেড়ে চলে তখন নীরব পাঠের অভ্যাস না থাকলে বিপদ ঘটে। নিচের ক্লাস থেকে

ছাত্রদের অল্পে অল্পে নীরব পাঠে অভ্যস্ত করে' রাখতে হবে, যাতে ওপরের ক্লাসে উঠে অসুবিধা না হয়।

মনশ্চক্ষে সমগ্র শব্দ বা বাক্যাংশের প্রতিরূপ দর্শন করার ক্ষমতা নীরব পাঠের ভিত্তি, এবং এই অভ্যাসের দ্বারা ছাত্রকে সরব পাঠ থেকে নীরব পাঠের দিকে অগ্রসর করতে হবে। এক-একটি শব্দ বা বাক্য বোর্ডে লিখে শিশুদের অল্পক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দিয়ে তারপর মুছে দিয়ে সেটি বলতে বা লিখতে দিলে নীরব পাঠের অভ্যাস হবে। তারপর সহজ, সংক্ষিপ্ত অংশ মনে মনে পড়ে' তার সারার্থ সংগ্রহ করতে করতে সম্পূর্ণ প্রবন্ধ বা গ্রন্থ নীরবে পাঠ করে' অর্থবোধ করার অভ্যাস হবে। "পুস্তকহীন" শিক্ষাপদ্ধতিতে নীরব পাঠের অভ্যাস আরো সত্বর এবং সহজে হয়।

নীরবপাঠের আর এক স্তর সারগ্রহণ (Skimming) বা চোখ বুলিয়ে অর্থবোধের ক্ষমতা। নীরব পাঠ যতই দ্রুত হ'কনা কেন তাতে প্রত্যেক শব্দের ওপর দিয়ে দৃষ্টিকে চালিত করা হয় বলে কিছু অধিক সময় যায়; কিন্তু তার চেয়ে দ্রুতবেগে কোন অংশের সারগ্রহণের প্রয়োজন হ'লে সমগ্র অর্থ বুঝে নেবার ক্ষমতা চাই। নীরব পাঠে খুব পটু না হ'লে এই ক্ষমতা লাভ করা যায় না। এর অভ্যাসের জন্য প্রথম প্রথম পাঠ্যাংশের প্রধান অংশ চিহ্নিত করে' দেওয়া যেতে পারে, পরে সংকেত ভিন্নই প্রধান বিষয়টুকু আপনি আবিষ্কার করার ক্ষমতা জন্মাবে। যে সব ছেলেপিলে খুব বেশি গল্পের বই পড়ে তাদের আপনা থেকে এই অভ্যাস জন্মায়।

এই প্রক্রিয়ার অত্যধিক ব্যবহারের বিপদ এই যে তাতে ছাত্রের পড়াশোনা অগভীর ও ভাষাভাষা হয়ে যেতে পারে। পরীক্ষার সময়ে পঠিত বিষয়ের পুনঃ পাঠের জন্য অথবা দ্রুত কোনো অংশের সারগ্রহণের জন্য এই অভ্যাসের প্রয়োজন, তাই শিক্ষক দৃষ্টি রাখবেন যে উল্লিখিত প্রয়োজন ভিন্ন ছাত্রেরা যেন এর প্রয়োগে লিপ্ত না হয়।

লেখা

পড়ার চেয়ে লেখা কঠিন। চোখে দেখে চেনায় কেবল চোখের সংগে মস্তিষ্কের বোঝাপড়ার ব্যাপার, কিন্তু লেখায় মস্তিষ্কের মারফত চোখ ও হাতের পেশিসমূহের সামঞ্জস্যময় ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার প্রয়োজন। অপরপক্ষে, লেখায় শিশু কর্মশীলতার সুযোগ পায় বলে' এতে তার আগ্রহ দেখা যায়।

শিশুর পেশিসমূহকে সুসংযত করে' পরিচালন করার ক্ষমতা পরিপক্ক হ'তে একটু দেরি হয়। যেমন বন্য ঘোড়াকে ধীরে ধীরে পোষ মানিয়ে রশ্মির সূক্ষ্মতম ইংগিতমাত্রের বশ করতে অনেক প্রয়াসের প্রয়োজন, তেমনি শিশুর পক্ষে অবাধ্য ও অনভ্যস্ত পেশিসমূহকে আয়ত্ত করাও বহু সাধনাসাধ্য।

শিশুশ্রেণীতে লিখতে শেখানর আগে নানা খেলার দ্বারা পেশিপরিচালন ক্ষমতাকে দৃঢ় করা হয়। তেঁতুলবীচি বা পাথরের টুকরো সমান রেখায় সাজান, মোজাইকের ছবি তৈরি করা, পুঁথির মালা গাঁথা, বিল্ডিং ব্লক্স্ দিয়ে বাড়ি তৈরি করা প্রভৃতির সহায়ে এই কাজ সাধিত হয়। এই সব প্রক্রিয়া যাতে যান্ত্রিক অভ্যাস না হয়ে খেলার উপলক্ষ্যে করান হয় সে বিষয়ে শিক্ষকের সচেতন হওয়া চাই। অর্থাৎ তিনি একটা রেখা টেনে দিয়ে তার ওপর বীচি বা পাথর সাজাতে বলবেন না, শিশুরা স্বেচ্ছাক্রমে সেগুলিকে কুচকাওয়াজরত সৈনিক বা ব্যায়ামরত বালক মনে করে' বা অন্য যে-কোন কল্পনায় শ্রেণিবদ্ধ করবে, অথবা কাঠের টুকরোর বাড়ি বানিয়ে, বীচি বা পাথরের দেয়াল, পথ ঘাট ইত্যাদি রচনা করবে। শিশুশ্রেণীতে এই খেলাধূলা ব্যক্তিগত থেকে সামাজিকতার ভিত্তিতে উত্তীর্ণ হয়ে পরে সহযোগিতামূলক কার্যকলাপে পরিণতি লাভ করে।

সংগে সংগে লেখার যন্ত্রপাতির সংগেও শিশুর পরিচয় সাধন করা হয়। দেখা গেছে যে শিক্ষিত পরিবার থেকে আগত শিশু অশিক্ষিত পরিবার থেকে আগত সমান অথবা অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর চেয়ে বেশি তাড়াতাড়ি লিখতে শেখে। লেখাপড়ার আবহাওয়া ও তার যন্ত্রপাতির সংগে পরিচয়ই এর কারণ।

প্রথমে লেখার উপকরণের মধ্যে সবচেয়ে যা মোটা তাই শিশুর হাতে দিতে হবে। পেন্সিল বা কলম চালনা করার মত সূক্ষ্ম গতিবিধি তার অনভ্যস্ত পেশীর পক্ষে সম্ভব নয় বলে' এসব তার হাতে দিলে ক্ষতির সম্ভাবনা। স্কুলের নিচের ক্লাসের ঘরের দেয়ালের চারদিক, নয়ত অন্তত পক্ষে একদিক, জুড়ে নিচু, লম্বা, কালো বোর্ড লাগান থাকা চাই। এই বোর্ড আলগা ঝোলান না হয়ে সিমেণ্ট কন্‌ক্রিটের হ'লেই নিরাপদ। অথবা বিদ্যালয়ের সিমেণ্ট করা (যদি তা রঙিন বা অতিরিক্ত পালিশ করা না হয়) বা নিকোনো মেঝের ওপর মোটা রঙিন খড়ি দিয়ে শিশুর প্রথম লেখার প্রয়াস মুক্তি পায়। এই লেখা বর্ণমালার অনুলেখন নয়, যথেচ্ছ আঁচড় কেটে লেখনযন্ত্রের পরিচালনের অভ্যাস। প্রথম প্রথম হয়ত সে খড়ি ধরতে পারে না, হয়ত একটা রেখাও আঁকতে পারে না, কিন্তু অদম্য অধ্যবসায়ের সংগে চেষ্টা করে' চলে। শিক্ষকের অল্প সাহায্যের ফলে প্রথমে সে নানারকমের দাগ কাটতে পারে, পরে দুটি সমান্তরাল রেখার মধ্যে নক্সা কেটে হাতের লেখার ভিত্তি স্থাপন হয়। আমাদের দেশে শিশুকে যে হাতে খড়ি দিয়ে উঠোনে ছেড়ে দেওয়া হ'ত তার একটা উপকারিতা ছিল এই যে লিখবার বিরাট ক্ষেত্র পেয়ে শিশুর লিখবার ইচ্ছাও বিরাট হয়ে উঠত। বাড়িতে ছেলেপিলেদের একটুকরো খড়ি বা পেন্সিল পেলে যে সমস্ত ঘরদোর রং করে' ফেলতে দেখা যায়, সেও ওই প্রবৃত্তিরই রূপান্তর।

এই অভ্যাস কিছুদূর অগ্রসর হ'লে পর শিশুকে রঙের গোলা আর মোটা তুলি দিলে হাতের স্পর্শ পরিষ্কার (delicate) হবে। বেনের দোকানে সামান্য দামে গুঁড়ো রং কিনতে পাওয়া যায়, শিক্ষককে কেবল দৃষ্টি রাখতে হবে যে শিশু রং না খেয়ে ফেলে। বড় বড় কাগজের রসদ জোগানও কঠিন হবে না, শিশুরা পুরনো খবরের কাগজের ওপরই আঁচড় কেটে, ছবি এঁকে আনন্দ পাবে।

ক্রমশ এই আঁচড়গুলির আকার স্পষ্ট হবে এবং গোল, চারকোনা প্রভৃতি নানা আকৃতির মধ্যে তার কয়েকটি প্রিয়বস্তুর মূর্তিও উঁকি মারবে; এগুলি স্বেচ্ছায়, সচেষ্টভাবে অংকিত নয়, শিশুর অবচেতনার সৃষ্টি; সম্ভবত এগুলি সে সচেতনভাবে আঁকতে পারবেও না।

আর একটু বড় শিশু অনেক সময়ে এঁকেই আত্ম প্রকাশ করে। আমি দুটি ছেলের কথা জানি, যারা লিখতে শেখার পরও গল্প এঁকে দিস্তার পর দিস্তা কাগজ ভর্তি করে' ফেলত।

একদিকে শিশুর হাতে লেখনযন্ত্র দিয়ে অন্যদিকে তাকে অক্ষরের আকৃতির সংগে পরিচিত করলে সেগুলিও তার ছবির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করবে। এই ব্যবস্থা অক্ষর পরিচয় নয়, কেননা এখন অক্ষরের আকৃতি দেখতে ও তাই নিয়ে খেলতে দেওয়া হয় খেলনা হিসাবে, অক্ষর বলে' নয়। মন্তেসরিপদ্ধতির ব্যবহৃত মোটা কাগজে কাটা অক্ষরের আকৃতি শিশুর হাতে দিলে সে সেগুলি নেড়েচেড়ে, তার ওপর আঙুল বুলিয়ে, বালির বাক্সে (sand tray) তার ছাপ ফেলে বা আঙুল দিয়ে তার অবলম্বনে বালিতে দাগ কেটে (tracing) সেগুলির আকৃতির সংগে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করবে। যে শিশু তুলির ব্যবহার শিখেছে তাকে বাংলা অক্ষরের Stencil দিলে সেগুলির ওপর তুলি বুলিয়ে অক্ষর আঁকতে পারবে।

ক্রমে শিশুর হিজিবিজি চিত্রসমূহের মধ্যে দুয়েকটি অক্ষর উঁকি মারে।

হয়ত তাদের আকৃতি বিশুদ্ধ নয়, হয়ত সেগুলি উল্টোপাল্টা, বাঁকাচোরা মূর্তিতে এসে উপস্থিত হয়, হয়ত সেগুলির সম্বন্ধে শিশু সচেতন নয় এবং চেষ্টা করলে লিখতে পারে না, তবু তারা অক্ষরাকৃতির স্মৃতির ছায়া। শিক্ষক নানা কাজ ও খেলার উপলক্ষ্যে পাড় (border) আঁকার অভ্যাস করিয়ে এই অক্ষরগুলিকে সমান্তরাল রেখার ছকে ফেলে শ্রেণিবদ্ধ লেখার ভিত্তি স্থাপন করবেন। এখন এদের অবচেতনলোক থেকে চেতনার আলোকে উপনীত করা তাঁর মস্ত কাজ।

শিশু যতদিনে একদিকে ছবি, খেলা ও কাজের সাহায্যে পড়তে শিখছে, ততদিনে অন্যদিকে অক্ষরের প্রতিকৃতি চিত্রিত করে' চলেছে। দুটি প্রক্রিয়া পাশাপাশি চলতে চলতে একদিন তাদের সংযোগ ঘটে; সেদিন শিশুশিক্ষার মাহেন্দ্রক্ষণ এবং সেদিন থেকে সচেষ্ট অধ্যবসায় দ্বারা তার ক্রমোন্নতি ঘটবে।

ক্লাসের ঘরে যদি রঙিন ছবি ও তার সংগে যুক্ত শব্দ, গল্প ও ছড়া চার-দিকে টাঙান থাকে তবে শিশুর পড়ার মত লেখাও সহজ হয়। পরে সে নিজেই জিনিষের নাম লিখে, কেটে, ছবির সংগে সংযুক্ত করতে পারে। নানাপ্রকার কাজ ও খেলার মধ্য দিয়ে এই পদ্ধতি সফল হয়। কর্ম ও ক্রীড়ামূলক শিক্ষাপদ্ধতিতে শ্রেণীর সমস্ত পাঠই খেলা বা কাজের পরি-কল্পনাকে ঘিরে পরিচালিত হয়। তাতে যে কেবল ব্যবহারের তাগিদে শিক্ষার চাহিদা বাড়ে তা নয়, শিক্ষার সমগ্রতাবোধ হওয়ার ফলে অখণ্ড পূর্ণ মনুষ্যত্বের ভিত্তি স্থাপন হয় এবং মাতৃভাষাকে সকল শিক্ষাপ্রেরণার মূলস্বরূপ পাওয়া যায়।

শিশুর নবজাগ্রত আমিত্ববোধের সহায়তায় তাকে নিজের নাম লিখতে প্রবৃত্ত করা যায়,—যেমন পড়ার সময়েও সে নিজের নাম চট করে' পড়তে শেখে। তারপর মাস, বার ও তারিখের কার্ড টাঙানোর পরিবর্তে সেগুলি

বোর্ডে লেখান যায়, খবর বলার পর সেগুলি বোর্ডে লেখান যায়। লেখার শক্তি কিছু পরিণতি পেলে প্রত্যেকে এক-একটি বিশেষ খবর লিখে দেয়াল-পত্রীতে সেঁটে দিতে পারে। শ্রেণিকক্ষের উপকরণ, বাগানের বা অন্যান্য হাতের কাজের হিসাব, তালিকা, বিবরণ, পুতুলের বিয়ে, চড়ুইভাতি ও অন্যান্য পরিকল্পনার বিবরণী ও প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র প্রভৃতি লিখে লেখার যথেষ্ট অভ্যাস হয়।

সচেতনভাবে বস্তুসমূহের নাম লিখতে পারার সময় থেকে শিশুকে ছবির বই বানাতে দিলে তার আনন্দ ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়, তার স্বাভাবিক সংগ্রহপ্রবৃত্তি লেখার কাজের প্রেরণা জোগায়। সাধারণ, মোটা, ব্রাউন কাগজের খাতা সেলাই করে' তাতে রঙিন ছবি সেঁটে তার বই তৈরি হবে। প্রথম প্রথম সে জিনিষের নাম লিখে সন্তুষ্ট হবে, তারপর ক্রমে সেগুলির বিষয়ে দু'চারটি কথা লিখতে চাইবে। এই সময়ে ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী আলাদা আলাদা বই করতে দিলে ভাল, যেমন, এরোপ্লেন, জাহাজ, মোটর, ফুলফল, পাতা, জীবজন্তু, সব বিষয়ে একেকটি বই তৈরি হতে পারে। প্রয়োজনীয় ছবি সংগ্রহ করার জন্য ডাকটিকিটের মত ছবি বদল করা যেতে পারে। এতে লেখার সংগে সংগে সাধারণজ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং সজ্জিত ও সুসংবদ্ধ হয়। ক্লাসের পরিকল্পনা (project) নিয়েও বই লেখা যায়। যেমন, প্রথম শ্রেণীতে পথচলায় নৈরাপত্তের নিয়মসমূহ নিয়ে পরিকল্পনা হয়ে যাওয়ার পর ছেলেরা সচিত্র বই লিখেছিল। পরিচিত বা স্বরচিত ছড়া ও গল্প নিয়েও, বই তৈরি করা যায়। বই তৈরি করার সময়ে শিশুদের ছবি আঁকায় উৎসাহ দিতে হবে, কেবল সংগ্রহ করায় নয়। শ্রেষ্ঠ বইগুলি বিদ্যালয়ের প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে সাজান হ'লে সকলে নিজের বই সুন্দর করতে চেষ্টা করবে।

সুন্দর হাতের লেখা শুধু দেখতেই সুন্দর নয়, লেখকের সৌন্দর্যবোধ,

শিল্পনৈপুণ্য ও যত্নশীলতার পরিচায়ক। হাতের লেখা সুন্দর করার চেষ্টায় ওই গুণগুলিও ছাত্রদের মধ্যে বিকশিত হয়। সুন্দর হাতের লেখা পরীক্ষা-ক্ষেত্রে ছাত্রের একটি মূল্যবান সহায়। অপরপক্ষে নোংরা হাতের লেখা অযত্ন ও অবহেলার পরিচয় দেয় নতুবা বোঝায় যে ছাত্রের মনন ও রূপায়ণের শক্তির সামঞ্জস্য হয়নি। মনের ভাব স্পষ্ট না হ'লেও অনেক সময়ে হাতের লেখা অস্পষ্ট ও অপরিষ্কার হয়। মন খারাপ হ'লেও হাতের লেখার অবনতি ঘটতে দেখা যায়। একবার একটি ছোট ছেলে নোতুন স্কুলে গিয়ে কিছুতে স্বচ্ছন্দ হ'তে পারছিল না, তাহার হাতের লেখাও সেই সংগে খারাপ হয়ে যায়। কিছুদিন পর যখন সে তার পরিবেশের সংগে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিল তখন তার হাতের লেখাও তার পূর্বসৌন্দর্য ফিরে পেল। ডাক্তার যেমন রোগের লক্ষণ দেখে ওষুধ দেন শিক্ষকও তেমনি চরিত্রের বহির্লক্ষণ হাতের লেখাকে শিক্ষার একটি যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করেন।

বিদ্যালয়ের পরিভাষায় "লিখতে শেখা" ও "হাতের লেখা" দুটি আলাদা কথা হ'লেও দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে গভীর যোগ আছে। যে সব শিশু আধুনিক পদ্ধতিতে লিখতে শেখে, অনেকদিন ধরে' লেখার যন্ত্র ঘাঁটাঘাঁটি করার ফলে তাদের হাতের লেখা প্রায় ভালই হয়। তাছাড়া এই পদ্ধতি অনুযায়ী লিখতে শেখার প্রথম স্তর ছবি আঁকা ও হাতের কাজের পর্যায়ভুক্ত হয় বলে' সে চিত্রাংকনের মতই মনোযোগের সংগে সুন্দর লিপি প্রস্তুত করে। এতে হাতের লেখা স্বভাবতই ভাল হয় বলে' আলাদা করে' হাতের লেখা না লেখানই ভাল। যত্ন করে নিজের হাতে ছবির বই তৈরি করায় সমান কাজ হয় এবং তাতে সৃষ্টির আনন্দ ও গর্ব মিশে থাকে বলে' হাতের লেখার নীরস প্রক্রিয়ার চেয়ে অনেক চিত্তাকর্ষক। যে শিশু দু'পাতা হাতের লেখা লিখতে সমপরিমাণে কালি ও চোখের জলের ধারা বইয়ে দেয় সেই বিনা আয়াসে সম্পূর্ণ ছবির বই তৈরি করতে পারে।

হাতের লেখা যদি লেখাতেই হয়, তবে হস্তলিপির বই (copy book) ব্যবহার না করে' শিক্ষকের নিজের হাতে শিশুর খাতায় একছত্র লিখে দেওয়া ভাল ঃ তাতে শিক্ষকের হাতের চালনার ভংগী দেখে শিশু উপকৃত হয়। যে সব শ্রেণীতে অনেক ছাত্র সেখানে প্রত্যেকের খাতায় আলাদা করে' লিখে দেওয়া অসম্ভব হ'লে, শিক্ষক বোর্ডে একছত্র লিখে দেবেন। শিক্ষকের হাতের লেখা খারাপ হ'লে হস্তলিপির বই ভিন্ন গত্যন্তর নেই, কিন্তু সে ক্ষেত্রে শিশুরা প্রত্যেকটি অক্ষর যথার্থ প্রক্রিয়ায় লিখছে কিনা সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। একটি ছেলে "ত" এর পুঁটলিটি বসাবার সময়ে বিপরীতভাবে হাত ঘোরাত বলে' ওই অক্ষরটি উল্‌টো লিখত আর আকারাদির আগে অক্ষর লিখত বলে' এ-কার, ই-কার প্রভৃতির ক্ষেত্রে লেখা অসমান হ'ত।

শিক্ষকের লেখা দেখেই হ'ক বা হস্তলিপির বইয়ের অনুকরণেই হ'ক একছত্র বারবার লিখে হাতের লেখার অভ্যাসের চেয়ে পুরো সাহিত্যাংশের অনুলেখন (copying) বেশি সার্থক। হাতের লেখা নিতান্তই যান্ত্রিক কাজ এবং তার শ্রম লাঘব করার জন্য ছেলেরা সময়ে সময়ে এমন সব চালাকির ব্যবস্থা নেয় যাতে তার উপকারিতা অনেক কমে যায় ; অপর পক্ষে সুন্দর সাহিত্যাংশের অনুলেখন স্বয়ংসঞ্চয়ন বা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে উদ্ধৃতি সংগ্রহের জন্য করালে তাতে ছাত্রের মন ও হাত একসংগে কাজ করে।

হাতের লেখার ভালমন্দ বিচারের সময়ে শুধু অক্ষরের ছাঁদ দেখলে চলবে না, সংগে সংগে দেখতে হবে সেগুলির আয়তন সমান হয়েছে কিনা, দুই শব্দের মধ্যে সমান ব্যবধান আছে কিনা, লাইন সোজা হয়েছে কিনা এবং কাজটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়েছে কিনা। শিশু যখন প্রথম লিখতে আরম্ভ করে তখন বড় কাগজে মোটা লাইন টেনে তাকে বড় বড় হরফ

লিখতে উৎসাহিত করতে হবে। ক্রমশ সাধারণ খাতার লাইনে চলবে এবং তৃতীয় ধাপে অনেকে 'ডবল' লাইনের খাতা পছন্দ করেন। তবে শেষ পর্যন্ত যেন শাদা খাতায় লাইন সোজা রেখে লেখার অভ্যাসটাই আদর্শ থাকে। শাদা খাতায় প্রথম লিখবার সময়ে বেঁটে কাগজ দিলে ওপর ও নিচের সীমার সংগে সামঞ্জস্য রেখে লাইন সোজা করতে স্থবিধা হয়। হাতের লেখা ভাল হ'লেও যদি কালির ছিটে বা কাটাকাটিতে ভরা থাকে তা হ'লে নিন্দনীয়। পরিচ্ছন্নতা (neatness) যে কোন শ্রেণীর লেখার প্রধান অংগ। একটু বড় ছেলের খাতায় ছেদচিহ্নের প্রয়োগ হওয়া চাই।

লিখবার সময়ে বসার ভংগী এবং কাগজকলম ধরার পদ্ধতি যত্নের সংগে লক্ষ্য করার বিষয়। কলম যদি ঠিক করে' ধরা না যায় তবে লেখা ভাল হয়না, তাড়াতাড়ি লেখার অস্থবিধা হয় এবং লিখতে লিখতে হাতে ব্যথা হয়। কাগজ ধরার ও বসার ভংগীর ভুল সাধারণত একসংগে হয়। ঠিক করে' বসতে না পারলে সোজা করে' কাগজ ধরা যায়না আর সোজা করে' কাগজ ধরা না থাকলে বসারও স্থবিধা হয়না। বাঁকা করে' বসলে বা কাগজ ধরলে বক্রদৃষ্টিতে দেখে লিখবার ফলে চোখ খারাপ হয়, আবার অনেক সময়ে যাদের চোখ খারাপ তারা বাঁকা হয়ে বসে' কাগজ বাঁকা করে' ধরে' লেখে। তাই ভাল করে' মূলানুসন্ধান করে' এই দোষের সংশোধন করা উচিত।

লেখার যন্ত্রের সম্পর্কে কিছু আলোচনা আগে হয়েছে। খড়ি ও তুলি ছেড়ে পেন্সিল ধরার সময় প্রায় বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতেই আসে, তৃতীয় শ্রেণীর পর থেকে ধীরে ধীরে কলম ধরান হয়। কলমের নিব প্রথম প্রথম মোটা হওয়া চাই। একটু বড় হ'লে ছেলেপিলেরা প্রায় নিজের জেদেই ঝর্ণাকলম ধরে। এই বিষয়ে অনেক শিক্ষক

বিরোধিমত পোষণ করেন এবং অনেকের ধারণা এই যে ছোটবেলা থেকে ঝর্ণাকলম ধরলে হাতের লেখা খারাপ হয়ে যায়।

একটু চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে এই বিশ্বাস যুক্তিসংগত নয়। ঝর্ণাকলমের ব্যবহারে খরচ সামান্য একটু বেশি। আজকাল সাড়ে ছ'আনার দরেও এই জিনিস বিক্রি হয়। সস্তা ঝর্ণাকলমের নিবেরও সাধারণ কলমের নিবের থেকে খারাপ হবার কথা নয় আর অল্প একটু দামী ঝর্ণাকলম কিনতে পারলে ত কথাই নেই। আমার বহুপরীক্ষিত অভিজ্ঞতা এই যে প্রথম থেকেই বালকের হাতে ঝর্ণাকলম দেওয়া বাঞ্ছনীয়। সময় ও গতিবিজ্ঞানের (time and motion study) জন্মের পর থেকে এবিষয়ে দ্বিরুক্তি হওয়া উচিত নয়। সাধারণ কলমে লিখতে বার বার কালি নেওয়ার প্রক্রিয়ায় লেখার গতি ব্যাহত হয়, সময় নষ্ট হয়, লেখার দিক থেকে মনোযোগ বিকর্ষিত হয়। ঝর্ণাকলমে এ-সব অসুবিধা নেই। তাছাড়া কালি ফেলে ঘরদোর নষ্ট করার বিভ্রাটের সম্ভাবনা ঝর্ণাকলম ব্যবহারে অনেক কম।

সবশেষে শ্রুতিলিখনের বিষয়ে দু'এক কথা বলব। বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণত বানানশুদ্ধির পরীক্ষার জন্য শ্রুতিলিখন দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এতে বানানশিক্ষার সুবিধা হওয়ার পরিবর্তে অন্ধভাবে মুখস্থ করার অভ্যাস হয়। অপরপক্ষে কানে শুনে লেখার ক্ষমতা অনেক কাজে লাগে। যে-ছেলে কলেজে যাবে তাকে 'লেকচার' শুনে নোট নিতে হয় আর কর্মক্ষেত্রেও অনেককে এই প্রক্রিয়ার ব্যবহার করতে হয়। হাতের লেখার পক্ষেও এর উপযোগিতা আছে, এতে তাড়াতাড়ি অথচ পরিষ্কার করে' লেখার অভ্যাস হয়।

শ্রুতিলিখনের অভ্যাসকে বাস্তবিক কাজে লাগাতে হ'লে এমন অংশ নিতে হবে যাতে কঠিন বানান বেশি না থাকে। তারপর যদি

ছাত্রদের নির্দিষ্ট অংশটি আগে পড়ে' আসতে বলা যায় অথবা লিখবার সময়ে কঠিন শব্দগুলি বোর্ডে তুলে দেওয়া যায় তবে ছাত্রেরা বানান সম্বন্ধে দুর্ভাবনামুক্ত হয়ে লেখার অভ্যাসরূপে কাজটি করতে পারে।

শ্রুতিলিখনকে চিত্তাকর্ষক করার জন্য সুন্দর গদ্য ও কাব্যাংশ বেছে নিতে হবে। এই অংশগুলি স্বয়ংসঞ্চয়ন, রচনা প্রভৃতির জন্য ব্যবহার করা যায়। বস্তুত, সোজাসুজি শ্রুতিলিখন না দিয়ে এইগুলিকে উপলক্ষ্য করে তার' অবতারণা করলে ছাত্রের আগ্রহ বজায় থাকবে ও তারা আনন্দের সংগে লিখবে।

রচনা

কোন কিছু গড়ে' তোলাকে রচনা বলা যেতে পারে। ভাষার রচনা যে কাগজে লিপিবদ্ধ করতে হবে এমন কোন কথা নেই। শিশু যখন প্রথমে মুখে মুখে বাক্যরচনা করে তখন থেকেই তার রচনার সূত্রপাত হয়; লিখতে-পড়তে শেখার আগে সে এইরূপ মৌখিক রচনার পদ্ধতি আয়ত্ত করে' নেয়। 'আমি আম খাব' বা 'গোলাপফুল লাল'—শিশুমনের সম্পূর্ণ রচনা।

খেলা ও কাজের মধ্যে দিয়ে কি ভাবে ক্রমশ মৌখিক ও লিখিত রচনার অভ্যাস হয় তার আভাস পূর্বপরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। খবর বলা ও লেখা থেকে আরম্ভ করে' ক্লাসের কাজের পরিকল্পনা আলোচনা ও হিসাবনিকাশ সবই রচনার প্রয়াসের অন্তর্গত। তাছাড়া শিশু ছবির বইয়ের জন্য গল্প লিখবে ও রচনা করবে এবং ক্লাসের পরিকল্পনাজাত জ্ঞান বিধিবদ্ধভাবে লিখে রাখবে। এর উদাহরণও পূর্বপরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে।

রচনার মূল বাক্য। শিশু প্রথমে সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ বাক্য বলতে শিখবে, পরে খাতায় লিখবে। এইজন্য তার বাক্যগঠনের দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি রাখতে হবে। ব্যাকরণ ও রীতিসম্মত অথচ সহজ ও উজ্জ্বল বাক্যই সুন্দর রচনার ভিত্তি।

বাক্যরচনার সংগে বাক্যপরম্পরা সজ্জিত করার অভ্যাস করাতে হবে। শিশু একটি বাক্য বলে' বিরত হবেনা, যে কটি বাক্যেই হ'ক, তার বক্তব্যবিষয় সম্পূর্ণ করবে। কর্মভিত্তি শিক্ষাপদ্ধতি তার বক্তব্যের

প্রেরণা ও বিষয়বস্তু জুগিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। এতে বিদ্যালয়ের প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে সুন্দর রচনার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

গল্পের সাহায্যেও রচনার অভ্যাস সহজে করান যায়। মৌখিক কাজের পরিচ্ছেদে চিত্রভূমিক গল্পরচনার কথা বলা হয়েছে, লিখবার সময়েও এই রীতি অবলম্বন করা হয়; দুই কাজ একসংগেও করা যায়, শিশু মুখে মুখে রচনা করে' পরে খাতায় লিখতে পারে।

শিশুর রচনা যেন সংক্ষিপ্ত হয়। প্রথমে এক অনুচ্ছেদের বেশি লিখবার দরকার নেই। অনুচ্ছেদরচনা রচনার একটি কঠিন অংগ, কিন্তু শিশুর সজীব মন আগ্রহজনক বস্তু পেলে সহজেই তাতে সাফল্যলাভ করবে। যেমন, ক্লাসে একটি ছবি দেখান হ'ল,—একটা বেড়াল একটা গোলা খাঁচার ভেতরকার পাখীটিকে ধরবার চেষ্টা করছে। এটি অবলম্বনে রচিত দুটি গল্পের নমুনা নিচে দেওয়া হ'ল।

১। দিদির মেনি বড় দুষ্টু। ঝি পিসিমার টিয়াপাখীর খাঁচা খুলে রেখেছিল। মেনি পাখীকে খাবার চেষ্টা করছিল। মা মেনিকে তাড়িয়ে দিলেন।

২। আজ সকালে আমাদের বাড়িতে একটি কাণ্ড হয়েছিল। ঝি পিসিমার টিয়াপাখীটাকে খাবার দিয়ে খাঁচার দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছিল আর সেই অবসরে দিদির পোষা মেনি এসে তাকে ধরতে গেছে। ভাগ্যিস মা টিয়াপাখীর চিৎকার আর ডানা-ঝটপটানি শুনে, তাড়াতাড়ি এসে, মেনিকে তাড়িয়ে দিলেন, না হ'লে টিয়াপাখী বেচারা মারাই যেত।

উপরের দুটিই গল্প, ছবির বিবরণমাত্র নয়, কিন্তু প্রথমটিতে বাক্যগুলি বিচ্ছিন্ন রয়েছে আর দ্বিতীয়টিতে গল্পের রস দানা বেঁধেছে। একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় এই যে পাখীটির মৃত্যুসম্ভাবনা দুটিতেই অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

একাধিক অনুচ্ছেদে গল্প লেখা এর পরের স্তর;—তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর আগে এই অভ্যাস করান উচিত নয়। কোন বিষয়কে কি ভাবে, কয় অনুচ্ছেদে বিভক্ত করতে হবে তা শিশুর পক্ষে বোঝা কঠিন, তাই প্রথম প্রথম আলোচনা করে' বোর্ডে সংকেত লিখে দেওয়া যায়। যেমন, একটা ছবিতে আছে যে দুটি ছেলেমেয়ে মাঠে একটা কুকুর ছানা কুড়িয়ে পেয়েছে। এই বিষয়ের তিনটি অংশ, কুকুরটিকে পাওয়া, বাড়িতে নিয়ে যাওয়া এবং পোষা। তিন অংশ তিন অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে' গল্পটি দাঁড়াল এই রকম -

"খুকু আর সোনা দুই ভাইবোন। একদিন মাঠে বেড়াতে গিয়ে তারা দেখল একটা ছোট্ট, সাদা ধবধবে কুকুরছানা পড়ে' পড়ে' কুঁই কুঁই করে' কাঁদছে। এই দেখে তাদের এত দয়া হ'ল যে কুকুরছানাটাকে বাড়ি নিয়ে এল।

"মা ছানাটাকে দেখে বললেন 'এটা বোধ হয় ভাল জাতের কুকুর হবে।' তিনি ওকে দুধ খেতে দিলেন আর একটা ছোট ঝুড়িতে ছেঁড়া নেকড়া দিয়ে নরম বিছানা পেতে দিলেন।

"সেই থেকে কুকুরটা ওদের খেলার সাথী হয়ে রইল। ওরা তার নাম দিয়েছে ঝুমরো।"

তাছাড়া পড়বার সময়ে যেমন চিত্র ও বাক্যপরম্পরার সাহায্যে গল্প পাঠ করান হয় তেমনি লিখবার সময়ে সেই পদ্ধতির ব্যবহার করলে অনুচ্ছেদবিভাগ সহজ হয়। একেকটি ছবি একেক অনুচ্ছেদের উপাদান-স্বরূপ হবে। প্রথমে ছবিগুলি দেখিয়ে, গল্পটি মুখে মুখে রচনা করিয়ে, তারপর ছবিগুলি সরিয়ে ফেলে গল্পটি লেখাতে হবে। শিক্ষক মাসিক পত্রাদির থেকে এরূপ চিত্রপরম্পরা সংগ্রহ করে' বড় করে' এঁকে রাখতে পারেন। শিক্ষক কিন্তু কখনও গল্পের আখ্যায়িকাটি নিজে গড়ে' তুলবেন

না, তিনি শিশুর কল্পনাশক্তি উদ্রিক্ত করে' তাকে দিয়ে গঠন করাবেন, কেননা, সৃষ্টির আনন্দ ভিন্ন এ-কাজ শিশুর কাছে সরস ও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতে পারে না।

এরপর ছবির সাহায্য ছাড়া গল্প লেখার পালা। শিশুর পূর্বপঠিত বা শ্রুত গল্প তাকে দিয়ে লেখাতে হ'লে প্রথমত মুখে মুখে গল্পটি বলে' বোর্ডে সংকেত লিখে দিতে হয়, শিশু সংকেত অবলম্বনে গল্পটি লেখে। এই অভ্যাস একটু পরিপক্ক হ'লে গল্প বলার সময়ে সংকেত লেখা হবে কিন্তু উপস্থাপনের শেষে বোর্ড মুছে দিয়ে শিশুকে লিখতে বলা হবে। পূর্ব-পঠিত গল্প লেখাতে হ'লে দৃষ্টি রাখতে হবে শিশু যাতে বইয়ের ভাষা মুখস্থ না করে। বইয়ের ভাষার ছায়া রচনায় আত্মপ্রকাশ নিশ্চয়ই করবে, কিন্তু হুবহু মুখস্থ করার প্রয়াস শুধু 'ষ্টাইল' নয়, ভাষাবিশুদ্ধি লাভেরও অন্তরায়।

শিক্ষক 'সংকেত' বা আখ্যানভাগের কাঠাম দিয়ে ছাত্রদের গল্পরচনায় প্রবৃত্ত করতে পারেন। এক শিক্ষক একটি ছেঁড়া কাগজ নিয়ে ছাত্রদের বলেছিলেন যে তাঁর গল্পলেখা কাগজ অনবধানতাবশত ছিঁড়ে গেছে এবং যে অংশ বাকি আছে তার অবলম্বনে ছাত্ররা সেটি যেন আবার রচনা করে' দেয়। এরূপ চাতুরী গল্প রচনার পরিবেশসৃষ্টিতে আগ্রহ আনে।

লেখা ছবি ও গল্পের বই প্রদর্শনীতে সাজিয়ে শিশুদের এবং দেয়ালপত্র, মাসিক পত্র প্রকাশের দ্বারা অপেক্ষাকৃত বড়দের রচনাকে পুরস্কৃত ও উৎ-সাহিত করা যায়।

ভাষার অধিকার ও বিষয়বস্তুর স্পষ্ট জ্ঞান রচনার ভিত্তি। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতিতে এই দুয়ের ভিত্তিস্থাপনের উপযোগী পরিবেশ পাওয়া যায়। ছেলেপিলেরা যা শেখে তা বাস্তবিক কার্যক্রমে ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা শেখে বলেই তাদের ধারণা স্পষ্ট হয়। ছবির বই তৈরি করে' যারা লিখতে শেখে তাদেরও স্পষ্ট ধারণাশক্তি ও সবল ভাষা হয়ে

থাকে। এ ছাড়া রচনার পূর্বে শিক্ষকের দ্বারা মৌখিক আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। লিখবার আগে আলোচনা করলে ছাত্রদের মনের যে ভাব-গুলি এলোমেলো ছিল সেগুলি স্পষ্ট ও সংবদ্ধ হয়ে রচনার উৎকর্ষ-সম্পাদন করে। যারা স্বচ্ছন্দে পড়তে পারে তাদের বই পড়ে' বিষয়ের জ্ঞান আহরণ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়। প্রবন্ধরচনা সম্পর্কে এই উপায়গুলির আরো আলোচনা করব।

রচনা শিক্ষার প্রথম অবস্থায় ভাষার সৌন্দর্যের চেয়ে ভাবপ্রকাশের স্পষ্টতার প্রতি বেশি দৃষ্টি রাখতে হয়। অতি অল্প বয়সে সুসাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা পণ্ডশ্রমমাত্র ; পরিষ্কার করে' বিশুদ্ধভাবে, পারম্পর্যরক্ষা করে', যুক্তি-সংগতরূপে (logically) ভাব প্রকাশ করতে পারা অধিক প্রয়োজনীয়। প্রাঞ্জল ও সরলভাবে ভাব প্রকাশ করাই স্বাভাবিক, কৃত্রিম 'ষ্টাইলের' প্রচেষ্টা ভাবকে আচ্ছন্ন করে। এই স্তরে গুছিয়ে লিখবার ক্ষমতার বিকাশই প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় হয় বলে' শিশুর মানসিক শক্তির বিকাশের বা বুদ্ধি ও মনীষার তারতম্য অনুযায়ী রচনাশক্তির তারতম্য সহজে ধরা পড়ে না।

এই স্তরে বিষয়বস্তু প্রধান, রচনারীতি বিশুদ্ধ ও যুক্তিসংগত হ'লেই হ'ল। ক্রমশ, ভাবকে গুছিয়ে প্রকাশ করার ক্ষমতা মজ্জাগত হয়ে গেলে, ভাষার কারিগরির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায়। এইবার যে স্বাভাবিক ব্যক্তিগত 'ষ্টাইলে'র উদ্ভব হবে তা ভাষাবিশুদ্ধি ও যুক্তিপরতার দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত। এই ভিত্তি না থাকলে ভাষার ছটা বা অলংকারবহুল বাগ্‌বিন্যাসের কোন অর্থ হয় না। অনেক শিক্ষক ছাত্রের লিখনরীতির উৎকর্ষসাধনের জন্য সুললিত বিশিষ্ট ভংগী মুখস্থ করান, কিন্তু এইরূপ কৃত্রিম-ভাবে আহৃত অলংকারসম্ভারের স্মৃতিতে তাদের কোন লাভ হয় না, তাদের ভাষার সাবলীল গতি ব্যাহত হয় মাত্র। এতে তাদের নিজেদের যে স্বাভাবিক, অনলংকৃত রীতি গড়ে' উঠতে পারত তার পথও বন্ধ হয়ে যায়।

ভাষার যে বিশিষ্ট ভংগীগুলি কেবলমাত্র সাধু ভাষার অলংকাররূপে ব্যবহৃত হয় সেগুলি শিখবার কোন প্রয়োজন নেই, আর দৈনন্দিন কথা-বার্তার মধ্যে প্রাকৃত বাংলার যেসব বিশিষ্ট প্রয়োগ প্রচলিত আছে, যেগুলির দ্বারা বিদ্যালয়ের ছাত্রের সত্যকার প্রয়োজন সাধিত হবে, সেগুলি সে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে আপনিই শিখে নেয়। উদাহরণস্বরূপ বাংলার কতকগুলি বিশিষ্ট ভংগীর উল্লেখ করা যায়, যেগুলি ছাড়া বাংলা ভাষার সম্পূর্ণ ব্যবহার অসম্ভব—যথা,—'করে, ফেলা', 'দিয়ে দেওয়া', 'নিয়ে নেওয়া'; ইত্যাদি যুক্ত ক্রিয়াপদ; 'দাঁত-টাত', 'ঘোড়া-টোড়া', 'খাবার-দাবার', ইত্যাদি শব্দের দ্বিত্ব; 'সোনার বাটি', 'কাঠের খেলনা' ইত্যাদি ক্ষেত্রে ষষ্ঠীর ব্যবহার প্রভৃতি। কণ্ঠস্থ করার পরিবর্তে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে এগুলি শেখা অনেক সহজ।

ছাত্রেরা যেমন বইয়ের ভাষা বা বিশিষ্ট সুললিত প্রকাশভংগী মুখস্থ করবে না, তেমন নোটবইও মুখস্থ করবে না। ভাষার গোড়াপত্তনে দুর্বলতা থাকলে এরূপ প্রবৃত্তি দেখা যায় কিন্তু বইয়ের ভাষা মুখস্থ করলে কত ক্ষতি হয় সে কথা আগে বলা হয়েছে। না জেনে মুখস্থ করার ফলে নিচু ক্লাসের ছেলেদের ভাষা অর্থহীন প্রলাপে পর্যবসিত হ'তে পারে আর উঁচু ক্লাসে অন্তত গুরুচণ্ডালী দোষ নিশ্চয় ঘটে।

অপরপক্ষে আদর্শের উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। আদর্শ সজ্ঞানকৃত চেষ্টার দ্বারা অনুকরণীয় নয়—তার প্রভাব ছাত্রের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে পড়লে ভাল হয়। এইজন্য নিচের ক্লাস থেকে একদিকে যেমন ভাষার সরলতা, প্রাঞ্জলতা ও যুক্তিযুক্ততার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে, অপর দিকে তেমনি শিশুকে সুন্দর লিখনরীতির প্রভাবের বশবর্তী করতে হবে। অতি ক্ষুদ্র শিশুর মধ্যেও এই অজ্ঞানকৃত অনুকৃতির অভ্যাস দেখা যায়। আড়াই বছরের শিশু যখন বলে "টাপুরটুপুর বৃষ্টি পড়ছে" কিংবা

চিড়িয়াখানায় গিয়ে জিজ্ঞাসা করে "এর গায়ে কেন কালো কালো দাগ ?" তখন সে নিজেই জানে না যে তার প্রথম উক্তিতে "বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর, ন'দেয় এল বান" এবং দ্বিতীয় উক্তিতে "বাদা বনের বুড়ো বাঘ, গায়ে কালো কালো দাগ" এই ছড়ার প্রতিধ্বনি রয়েছে। এইভাবে যে রীতির সূত্রপাত হবে, বড় বয়সে সাহিত্য সম্বন্ধীয় আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে তা স্বাভাবিকভাবে পূর্ণতা লাভ করবে।

সাহিত্য পাঠ ও সমালোচনা লিখনরীতি সুন্দর করার উপায়বিশেষ। স্বয়ং-সঞ্চয়নও এদিকে সাহায্য করে। আমাদের বিদ্যালয়সমূহে এইগুলি নিতান্ত অবহেলিত। বিশেষত বড় বড় লেখকদের ভাষার বিশেষত্বগুলির দিকে আমাদের ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় না। তাদের বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পাঠ ও শ্রবণ করান শিক্ষকদের একান্ত কর্তব্য। উচ্চতম শ্রেণীতে ভাষার বৈজ্ঞানিক আলোচনাও করা যায়। রচনার সম্পর্কে গদ্য-রীতি ও ব্যাকরণের আলোচনায় তাদের নিজস্ব রীতির উৎকর্ষ সাধিত হতে পারে।

অবশ্য, একথা বলা বাহুল্য যে ছাত্রদের চেষ্টা ও অনুরাগ উদ্রিক্ত না হ'লে চারিদিকের শত সুযোগ সত্ত্বেও লিখনরীতির উন্নতি হবে না! ছাত্রদের চেষ্টায় প্রবৃত্ত করার জন্য কতকগুলি অভ্যাসের (drilling) নির্দেশ দেওয়া হ'ল। এগুলি নানা খেলা ও প্রতিযোগিতার ছলে করাতে হবে।

ভাষাশিক্ষার প্রথম অবস্থায় শিশুদের কতকগুলি বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ দিয়ে জোড় বাঁধতে বলা যেতে পারে। যথা, একদিকে লাফাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে, উঠছে, বসছে, লিখছে প্রভৃতি আর অপরদিকে রাম, পাখী, খোকা, যদু প্রভৃতি শব্দের থেকে বেছে নিয়ে তারা 'ব্যাং লাফাচ্ছে,' 'খোকা চেঁচাচ্ছে,' 'পাখী উড়ছে,' 'রাম বসেছে,' 'যদু লিখছে' প্রভৃতি বাক্য রচনা করবে।

হয়ত কোন শিশু 'রাম উড়ছে' বা 'পাখী লিখছে' বা অনুরূপ অপপ্রয়োগ করতে পারে, কিন্তু শ্রেণীর সমবেত সমালোচনায় তৎক্ষণাৎ তা সংশোধিত হয়ে যাবার কথা।

এইভাবে বিশেষ্য-বিশেষণের প্রয়োগের অভ্যাস করান যায়। যেমন গাছ, বাঘ, কাক, বরফ, কুকুর প্রভৃতি বিশেষ্যের সংগে ঝাঁকড়া, কালো, ঠাণ্ডা, সবুজ, বড় প্রভৃতি বিশেষণ সংযুক্ত করে' 'সবুজ গাছ', 'বড় বাঘ', 'কালো কাক', 'ঠাণ্ডা বরফ', 'ঝাঁকড়া কুকুর' প্রভৃতি বাক্যাংশ তৈরি করতে পারে। এগুলিকে উল্টোপাল্টা করে' দিয়ে শিশুর সামঞ্জস্যবোধের পরীক্ষা করা যায়। যেমন একটি শিশুকে বলা হয়েছিল, —"আমি ঠাণ্ডা চা আর গরম আইসক্রীম খাচ্ছিলাম"—সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল "তুৎ বোকা! গরম চা আর ঠাণ্ডা আইসক্রীম।"

শূন্য-স্থান পূরণের বিভিন্ন প্রকার অভ্যাস হ'তে পারে; যথা—"কুকুর—কামড়েছিল", "রাম—মেরেছিল"; অথবা—"বেড়াল ইঁদুর—", "কাঠুরে কাঠ—", "ধোপা কাপড়—" ইত্যাদি।

বিশেষণাদির প্রয়োগদ্বারা বাক্যসম্প্রসারণ করান যায়। যেমন পূর্বলিখিত বাক্যগুলিকে—"কাঠুরে ভারি কুড়ুল দিয়ে মোটা কাঠ কাটছিল", "ধোপা ভাল সাবান দিয়ে রেশমের কাপড় কাচছিল," "আমাদের পোষা শাদা বেড়াল একটা প্রকাণ্ড মেঠো ইঁদুর ধরেছিল" ইত্যাদিতে পরিণত করা যায়। শিশু একবারে পূর্ণ সম্প্রসারণটি করতে পারবেনা, তাকে দিয়ে ধাপে ধাপে করাতে হবে, যেমন "এই গাছে ফুল ফোটে" কথাটিকে এইভাবে বাড়ান যায়—এই গাছে বসন্তকালে ফুল ফোটে"—"এইগাছে বসন্তকালে লাল ফুল ফোটে"—"এইগাছে বসন্তকালে অনেক লাল ফুল ফোটে" "এই বড় গাছে—ইত্যাদি, এই বড় গাছে প্রতি শীতকালে—" ইত্যাদি। বাক্যটিকে বাড়াবার সময়ে

ক্লাসের প্রত্যেক শিশুকে একেকটি করে' অতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগ করতে বললে ছেলেরা খেলার মত আনন্দ পাবে।

এর মধ্যেও উপযোগিতাবিচার চাই; যেমন "লাল বেড়ালটা একটা হলদে ইঁদুর ধরেছিল" বা "কাঠুরে করাত দিয়ে কাঠ কাটছিল" ইত্যাদি অচল।

বাক্যসংযোজনও একটি ভাল প্রক্রিয়া। "রাম পিঁড়িতে বসে" এবং "রাম ভাত খায়" এই দুই বাক্য মিলে হবে "রাম পিঁড়িতে বসে' ভাত খায়"। আমি পুকুরের ধারে গেছিলাম" আর "আমি মাছ ধরেছিলাম" মিলিয়ে হ'ল—"আমি পুকুরের ধারে গিয়ে মাছ ধরেছিলাম।'

বাক্যপরিবর্তন আরেক প্রকারের অভ্যাস। যেমন শিক্ষক শিশুকে আদেশ করলেন—"দরজা বন্ধ কর", তারপর তিনি অপরকে জিজ্ঞাসা করবেন—"আমি অমুককে কি বললাম?" সে উত্তর দেবে—"আপনি অমুককে দরজা বন্ধ করতে বললেন," এরূপ দীর্ঘতর অংশ কাগজে লিখে পরিবর্তিত করান যায়।

গল্পের বচন, কাল, পুরুষ ইত্যাদির পরিবর্তন করে' লিখতে বলা যায়। যেমন গল্প যদি হয়—"রামের একটা পোষা কুকুর ছিল, সে তাকে এমন শিক্ষা দিয়েছিল যে পয়সা দিলে দোকান থেকে মিঠাই কিনে আনত"। এর ভাষায় কিছু পরিবর্তন করে' ব্যাপারটাকে বর্তমানে নিয়ে আসা যায়, পুরুষগত পরিবর্তন করে' "আমার" কুকুরের গল্প করা যায়, অথবা "আমার যদি এমন একটি কুকুর থাকত" এইভাবে লেখা যায়। বিচক্ষণ শিক্ষক নিজেই অনেক নূতন নূতন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিবেন।

এই সকল "রচনার" অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে ব্যাকরণের শিক্ষাও চমৎকার হয়। উপরের প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যাকরণের একেকটি বিষয়ের পাঠ নিহিত আছে। এতে খেলার মধ্যে দিয়ে রচনা ও ব্যাকরণ উভয়েই শিক্ষা হয় অথচ চোখের জল পড়েনা।

কবিতা অবলম্বনে গল্প রচনা করান যায়। এতে কবিতার ভাষার ছটার ভেতর থেকে মূল গল্পটি বেছে নিয়ে প্রকাশ করাতে ভাষার সরলতা ও ভাবের প্রাঞ্জলতার অভ্যাস হয়। তা-ছাড়া কবিতার ভাষার প্রভাবে লিখনরীতি সুন্দর হ'তে পারে।

গল্প-লেখা বা রচনার বিভিন্ন প্রক্রিয়া ছাড়া পরীক্ষার খাতায় কয়েক প্রকারের রচনার প্রশ্নের প্রচলন দেখা যায়,—যেমন,—ব্যাখ্যা, ভাষান্তর (paraphrase), সারার্থ (summary), ভাবার্থ (substance), ভাবসম্প্রসারণ (amplification), অনুবাদ ইত্যাদি।

ভাষান্তরকরণের প্রয়োগ বাংলা পদ্য ভিন্ন গদ্যে নেই এবং এই প্রক্রিয়ার ব্যবহার যত কম করা যায় তত ভাল। এর মারাত্মক দোষ এই যে এইভাবে অর্থপ্রকাশ করতে গিয়ে বালকবালিকা মূলের প্রতিটি শব্দের পরিবর্তে প্রতিশব্দ বসিয়ে যেতে গিয়ে অনেক সময়ে হাস্যকর ভুল করে এবং সাধারণভাবে সাহিত্যের সমগ্র দৃষ্টি হারিয়ে ফেলে।

পাঠ্যপুস্তক বা কোন সাহিত্যাংশের উদ্ধৃতি ব্যাখ্যা করার জন্য দেওয়া হয়। দুয়ের সাধারণ প্রকৃতি এক, তবে পাঠ্যপুস্তক থেকে অংশ তুলে ব্যাখ্যা করতে দিলে লেখকের নাম ও অংশটির পূর্বাপর পরিচয় দিতে হয়। এই পরিচয় (context) পূর্বে দিয়ে তবে মূল ব্যাখ্যার আরম্ভ হয়। সংক্ষিপ্ত, অথচ সম্পূর্ণভাবে ঠিক যতটা পরিচয় দেওয়া দরকার ততটা পরিচয় দেওয়া পূর্বপরিচয়দানের রীতির আদর্শ। তারপর মূলের বিশ্লেষণের পুংখানুপুংখতার ওপর ব্যাখ্যা অংশের উৎকর্ষ নির্ভর করে। অনেকে মূল ব্যাখ্যার মধ্যে সব অংশ নিবদ্ধ করতে না পেরে পাদটীকা সংযুক্ত করে' দেন। অনেক "নোট-বই"য়েও এই রীতি দেখান হয়েছে। কিন্তু এতে ব্যাখ্যার সাহিত্যসৌন্দর্যের হানি হয়; যথেষ্ট নৈপুণ্যের সংগে ব্যাখ্যা করতে পারলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাদটীকার প্রয়োজন হয় না। নির্বাচন

ক্ষমতা, যুক্তিযুক্ততা, প্রাঞ্জলতা প্রভৃতি ক্ষমতার বিচার করার পক্ষে ব্যাখ্যা অংশের মূল্য খুব বেশী, এবং এই কাজটিতে অপেক্ষাকৃত পরিণতবুদ্ধির প্রয়োজন বলে' সপ্তম শ্রেণীর পূর্বে এর ব্যবহার না করা উচিত।

সারার্থ ও ভাবার্থ প্রকাশ অনেকটা এক ধরনের কাজ। প্রথমটিতে সমগ্র বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার দিতে হয় আর দ্বিতীয়টিতে মূল ভাবটিকে প্রকাশ করা চাই। সংক্ষেপে, সরলভাবে রচনার অভ্যাস করার পক্ষে এই প্রক্রিয়ার মূল্য থাকলেও এর বিপদও অনেক। প্রথমত এতে সাহিত্যাংশের সৌন্দর্যহানি হ'তে পারে। শিক্ষক যখন শ্রেণীতে একটি সুন্দর কবিতার রসানুভব করিয়ে তার সারাংশ বোর্ডে তুলে দিতে যান তখন সমগ্র পরিবেশে একটি বিপরীত প্রতিক্রিয়ার (anticlimax) সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত, বৃহৎ অংশকে সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে অনেক সময়েই বিমূর্তভাবের সৃষ্টি হয় যা উচ্চতম শ্রেণীর ভিন্ন ছাত্রদের বয়সোপযোগী নয়। এইজন্য সারাংশ উচ্চতম শ্রেণী ভিন্ন রচনা করতে দেওয়া উচিত নয়, দিলেও এমন বস্তুবহুল বিষয়ে দিতে হয় যার প্রধান প্রধান অংশ নির্বাচন করা সহজ এবং তাতে তার সৌন্দর্যহানি ঘটেনা। সর্বশেষে কবিতার সারাংশরচনা যতদূর সম্ভব বর্জনীয়।

ভাবসম্প্রসারণ অনেকটা প্রবন্ধজাতীয়। এতে নির্ধারিত অংশ অবলম্বন করে ছাত্র নিজ মনের ভাব প্রকাশ করে, বিষয়বহির্ভূত না হ'লে বাইরের কথা এর মধ্যে স্থান পেলে ভাল। এতে এবং ব্যাখ্যায় সম-উক্তিসংকলনের প্রয়োজন আছে।

অনুবাদ রচনাশিক্ষার জন্য আবশ্যিক প্রক্রিয়া নয় এবং যে-সব দেশে বিদ্যালয়ে দুটি ভাষার প্রচলন নেই সেখানে অনুবাদও চলতে পারে না। পুরাতন শিক্ষানীতিতে বিদেশী ভাষাশিক্ষার একটি প্রক্রিয়ারূপে বাংলা থেকে ইংরেজি এবং ইংরেজি থেকে বাংলার অনুবাদ ব্যবহৃত হ'ত।

প্রত্যক্ষ পদ্ধতির প্রচলনের ফলে ভাষাশিক্ষার উপায়স্বরূপ অনুবাদ অচল। তবে অনুবাদ কেন করা হবে ?

অনুবাদের কিছু সাহিত্যিক উপযোগিতা আছে। বর্তমান যুগে "এক-দুনিয়া"র আদর্শে বিশ্বসাহিত্যক্ষেত্রে অনুবাদ সাহিত্যের স্থান উচ্চ। এই কারণে এর অভ্যাস সাহিত্যানুশীলনের অংগীভূত করা যেতে পারে। ভাষার স্বাভাবিকতা রক্ষা করে' যতদূর সম্ভব আক্ষরিক অনুবাদ করা অনুবাদের আদর্শ; কিন্তু যে অংশের আক্ষরিক অনুবাদ সম্ভব নয় সে-সব অংশের ভাবানুবাদ করতে হয়। অনুবাদ যে কত অদ্ভুত হ'তে পারে তার আলোচনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "শিক্ষা" গ্রন্থে করেছেন। এই বিপদ এড়াবার জন্য অনেকে পুনরনুবাদের পন্থা নির্দেশ করেছেন, কিন্তু যে-ক্ষেত্রে পরসাহিত্যপরিচয় ভিন্ন অনুবাদের অপর প্রয়োজন খুঁজে পাওয়া কঠিন সে-ক্ষেত্রে উক্ত প্রক্রিয়া অনুবাদের মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে। বিজাতীয় ভাব ও ভাষার স্বাজাত্যসাধনেই অনুবাদের সার্থকতা এবং সেই কারণে বিদ্যালয়ের সাহিত্যিক অভ্যাসের মধ্য থেকে একে বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়।

তথাপি যতদিন বিদ্যালয়ে অনুবাদ করান হ'চ্ছে, ততদিন শিক্ষক অনুবাদ করাবেন ও তাতে সুপদ্ধতির অনুসরণ করবেন। অনুবাদ করার জন্য একটি সহজ ও সরস অংশ নির্বাচন করতে হবে এবং ক্লাসে এটি সাধারণ সাহিত্যাংশের মত প্রশ্নোত্তরদ্বারা আলোচনা করা হবে। ইংরেজি অংশের আলোচনা বাংলা ভাষায় করার ফলে ছাত্রদের পক্ষে কঠিন ও অজানা শব্দগুলিও জানা হয়ে যাবে। সাধারণ সাহিত্যাংশের মত আলোচনার সংগে বোর্ডের কাজ করা হবে—বাংলায়। উপস্থাপনের শেষে, বোর্ডের কাজ মুছে দিয়ে ছেলেদের অনুবাদটি করতে বলা হবে।

প্রবন্ধ রচনা

প্রবন্ধরচনার সাহিত্যিক প্রক্রিয়া উচ্চশ্রেণীর উপযোগী হ'লেও তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণী থেকেই সহজ বিষয় নিয়ে ছোট ছোট প্রবন্ধ লেখান যেতে পারে। যে-সব বিষয় ছাত্র জানে, যা লিখতে তার ভাল লাগে, সেইসব বিষয়েই তাকে লিখতে দেওয়া উচিত, কেননা তারই বর্ণনা সে উজ্জ্বলভাবে করতে পারবে।

শিক্ষাতত্ত্বের নিয়মে জানা থেকে অজানায় যাওয়ার যে বিধি আছে তার অনুসরণে অনেকে স্কুলের ডেস্ক, টেবিল, চেয়ার অথবা গরু ঘোড়া ইত্যাদি পরিচিত বস্তু অথবা জীবজন্তুর বিবরণের ওপর প্রবন্ধরচনার ভিত্তি স্থাপন করতে চান এবং 'আকৃতি-প্রকৃতি-প্রাপ্তিস্থান-উপকারিতা' প্রভৃতি একটা ছকও কেটে দেন। কিন্তু তাতে শিশুমনের সৃজনী শক্তিকে মোটেই অনুপ্রেরিত করা হয় না এবং তাকে পুরাতন কথার পুনরুক্তি করার বিড়ম্বনায় ফেলা হয়।

তার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তার কাছে প্রবন্ধরচনার অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক উপদান। সে হয়ত রাস্তায় দুটি গাড়ির ধাক্কা দেখেছে, হয়ত পাশের বাড়ির ছেলের সংগে তার মারামারি হয়েছে, তার ছোট বোন ঘুমের ঘোরে খাট থেকে পড়ে' গেছে, কিংবা হয়ত ক্লাসের বাগানে তার গাছগুলো সবচেয়ে বেশি সতেজ হয়ে উঠেছে, বা তার তৈরি ছবির বই স্কুলের প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। এইসব কথা যখন সে প্রচার করার জন্য উন্মুখ ঠিক সেই সময়ে গরুর দুটি শিং বা ডেস্কের চারটি পায়ের বর্ণনা লেখা তার পক্ষে নিতান্ত নিরুৎসাহজনক। এইজন্য তার প্রথম প্রবন্ধ রচিত

হওয়া উচিত চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয়ে। প্রাত্যহিক খবর, ক্লাসের কাজের বিবরণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এরূপ রচনার ভিত্তি কি করে' স্থাপিত হয় তা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীতেও বিষয়নির্বাচনে সমান সাবধানতার প্রয়োজন। সত্যবাদিতা, মহানুভবতা, জীবে-দয়া প্রভৃতি নির্বস্তু ভাব নিয়ে প্রবন্ধ রচনা ডেস্ক, বেঞ্চ ইত্যাদি নিয়ে লেখার মতই নীরস, উপরন্তু এ সব সম্বন্ধে বালকদের ধারণা সাধারণত অস্পষ্ট থাকে। তার চেয়ে ভ্রমণেতিহাসের নানা কাহিনী ও প্রত্যক্ষ বিষয়ের কথা নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে দিলে তাদের আগ্রহ বেশি হয়।

যে সব মামুলি বিষয় বিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে, যদি নিতান্তই সেগুলি অবলম্বনে প্রবন্ধ লেখাতে হয় তবে নূতনভাবে লেখান উচিত। যেমন নিচের ক্লাসের ছেলেপিলেকে জীবজন্তুর বিষয়ে সাধারণ প্রবন্ধ না লিখিয়ে তার পোষা কোন জন্তু বা পাখীর কথা লেখান যায় অথবা ডেস্কের বর্ণনা না করিয়ে ডেস্কের আত্মকাহিনী লিখতে বলা যায়। ওপরের শ্রেণীতেও গুণ নিয়ে নির্ব্যক্তিক আলোচনার পরিবর্তে বিশেষ ঘটনার বর্ণনায় সেগুলি ফুটিয়ে তোলা যায়। সেগুলির সুযোগ্য উদাহরণসংগ্রহে প্রতিযোগিতার ভাব থাকলে জ্ঞান এবং উৎসাহ দুইই বৃদ্ধি পেতে পারে।

প্রস্তুতি ও রচনার একটা নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করতে হয়।

প্রথমত, পরিচিত স্থলে বিষয়বস্তুর ভিত্তি স্থাপন। যেমন স্কুল থেকে ছাত্রদের কোনো কলকারখানা, ঐতিহাসিক স্থান বা চিড়িয়াখানা বা যাদুঘর বেড়িয়ে আনার পর, অথবা স্থানীয় কোনো বিশেষ ঘটনা, যেমন কোনো মেলা, সভা বা খেলার অনুষ্ঠান হয়ে যাবার পর সেই বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখান যেতে পারে। শ্রেণীতে পঠিত অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান অবলম্বন করে' প্রবন্ধ লেখান যেতে পারে, যেমন ভূগোলে নদীর বিষয়ে পড়া হবার পর

নদীর সম্বন্ধে বা ইতিহাসে কোনো মহাপুরুষের বিষয়ে পড়া হবার পর তাঁর জীবনকাহিনী নিয়ে প্রবন্ধ লেখান যায়। এ-সব ক্ষেত্রে সাহিত্যের শিক্ষককে সচেতনভাবে অন্যান্য শ্রেণীর পাঠের সংগে অনুবন্ধ স্থাপিত করতে হবে। আবার কোনো ঋতুর বিষয় নিয়ে রচনা লেখাতে হ'লে সেই ঋতুতে তা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, অন্য সকল প্রকার রচনার মত প্রবন্ধ রচনার পূর্বেও নির্দিষ্ট বিষয়ের অবলম্বনে বিস্তারিত মৌখিক আলোচনার প্রয়োজন আছে। ছাত্রের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সুসজ্জিত করা এবং অবচেতন চিন্তাকে চেতনালোকে উত্তীর্ণ করা এই আলোচনার উদ্দেশ্য। ছেলেরা অনেক কিছু দেখে ও জানে কিন্তু খেয়াল করে না, আর খেয়াল করলেও গুছিয়ে চিন্তা করে না। এইজন্য প্রবন্ধরচনার পূর্বে শিক্ষককে ছাত্রের মনকে প্রস্তুত করে' নিতে হয় এবং এই কাজ তিনি প্রশ্নের দ্বারা করেন। তাঁকে এমন বিচক্ষণতার সংগে প্রশ্ন করতে হবে যে অবচেতন সত্তার জ্ঞান চেতনালোকে জাগ্রত হবে এবং বিচ্ছিন্ন চিন্তা সজ্জিত হবে। তাঁকে প্রশ্ন পরম্পরার দ্বারা প্রবন্ধের কাঠাম তৈরি করতে হয় এবং বোর্ডে লিখে ছাত্রদের ধারণাকে স্পষ্ট করতে হয়।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক যে ষষ্ঠ শ্রেণীতে রেল ষ্টেশনের সম্বন্ধে রচনা লেখান হবে। প্রথমে শিক্ষক শ্রেণীর ছাত্রদের স্থানীয় ষ্টেশনে নিয়ে যাবেন। কলিকাতার বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্রদের হাওড়া, শিয়ালদা এবং অন্য কোনো ছোট ষ্টেশন দেখিয়ে আনতে পারেন। এই বেড়ানর উদ্দেশ্য কেবল আমোদ নয়, আনন্দের সংগে পুংখানুপুংখরূপ পর্যবেক্ষণ। অভাব-পক্ষে ছবির বই দেখান যেতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক পর্যবেক্ষণের সমান মূল্যবান কিছুই নয়। তারপর ওই পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে' ক্লাসে আলোচনা হবে। ষ্টেশন, রেললাইন, অন্যান্য যন্ত্রপাতি, প্ল্যাটফর্ম, আপিস,

গাড়ির ও যাত্রীর আসাগোনা, কর্মচারী ও তাদের কাজ, রেলপথের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়াংশগুলিকে স্পষ্টভাবে আলোচনা করে' প্রবন্ধ-রূপে সজ্জিত করতে হবে।

প্রবন্ধরচনার ক্রমের তৃতীয় কথা এই যে আলোচনার অব্যবহিতকাল পরেই সেটি লিখতে দেওয়া উচিত নয়। শিক্ষক ছাত্রের কাছে তার যে সর্বোত্তম প্রয়াস, প্রকাশের ভাষা ও ভংগীর যে মার্জিত রূপ আকাঙ্ক্ষা করেন তার বিবর্তন সময়সাপেক্ষ। এইজন্য আলোচনা ও লেখার মধ্যে কয়েকদিনের ব্যবধান রাখা শ্রেয়। উপযোগী গ্রন্থাদির সন্ধান বলে' দিলে ছাত্রেরা ইতিমধ্যে সেগুলি পড়ে' নেবে এবং এই সময়ের মধ্যে ক্লাসের কোনো বিষয়ের পড়ায় সম্পর্কিত প্রসংগের উত্থাপন হ'লে শিক্ষক তার প্রতি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। এইভাবে ছাত্রের মনের ভাব পরিপক্ক হবে, বিষয়ের ধারণা সুগঠিত হবে এবং প্রবন্ধরচনার দিন তার সমগ্র জ্ঞান সুসজ্জিত ও ব্যূহবদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে।

কিন্তু এত খেটে, এত সুন্দর করে' প্রবন্ধ লেখার মূলে একটা প্রেরণা চাই। ছাত্র যেন তার শ্রমকে সার্থক বলে' মনে করে। আগ্রহ ও সহানুভূতিই ছাত্রের প্রকৃত পুরস্কার। শিক্ষক যদি সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধগুলি বিদ্যালয়ের বা শ্রেণীর পত্রিকায় প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন অথবা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের রচয়িতাকে বিষয়টিকে নিচের শ্রেণীর ছাত্রদের কাছে উপকরণ-যোগে, চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থাপিত করার সুযোগ দেন, তবে এরূপ মৌলিক কাজে তারা উৎসাহ পাবে।

প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা ও আলোচনারীতির জটিলতার তারতম্যানুযায়ী কোন্ কোন্ শ্রেণীতে কি কি ধরনের প্রবন্ধ লেখান যায় তার একটি ধারা নির্দেশ করা সম্ভব। শিশু প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছোটখাট

বিষয়াবলম্বনে অনুচ্ছেদরচনায় অভ্যস্ত হয় এবং তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীতে অনুচ্ছেদপরম্পরার রচনায় উত্তীর্ণ হয়। এই সময়কার রচনা গল্পের মত সহজ, সরস ও বস্তুমূলক ; শ্রেণীর কার্যকলাপ, পোষা পশুপক্ষীর বিবরণ ; জন্মদিনের আমোদপ্রমোদ প্রভৃতির অভিজ্ঞতার বিষয়ে তারা গল্পচ্ছলে লিখতে পারে। এই ধরনের বিষয়বস্তুতে ঘটনাবলীর একটি সুনির্দিষ্ট ক্রম থাকে বলে' এগুলি নিয়ে প্রবন্ধ লেখা সবচেয়ে সহজ।

ক্রমে বিষয়বস্তু জটিল হ'তে থাকবে। তৃতীয়-চতুর্থশ্রেণীর ছাত্র হয়ত দীর্ঘতর ঘটনার বর্ণনা দিয়ে প্রবন্ধ লিখবে আর পঞ্চম-ষষ্ঠশ্রেণীর জন্য এমন বিষয়ের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে কয়েকদিনের ঘটনার ক্রমানুযায়ী বিবৃতি অথবা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনী ও স্থানসমূহের বর্ণনা, ঋতুবর্ণন প্রভৃতি কিছু জটিলতর কাজ থাকে। আবার হয়ত সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রেরা কোথাও ভ্রমণ করে' এসে তৎস্থানীয় ইতিহাস-ভূগোলের আলোচনা করবে এবং নবম দশম শ্রেণীরা তার সংগে ভূতত্ত্বের জ্ঞানেরও পরিচয় দেবে।

জ্ঞান বা তত্ত্বমূলক প্রবন্ধরচনা বর্ণনামূলক রচনার চেয়ে কঠিন। এইজন্য সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীর আগে এই প্রবন্ধ রচনা সফল হয় না। এতে আলোচনা, আহরণ ও সাধারণজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, বিমানপোতসম্বন্ধীয় প্রবন্ধরচনায় কিছু বৈজ্ঞানিক আলোচনা না থাকলে বিষয়টি নীরস ও নিরর্থক হবে। এই বিষয়কে সম্পূর্ণ করে' তুলতে হ'লে বিবর্তনের প্রত্যেক স্তরের বৈজ্ঞানিক আলোচনা এবং অতীত ও বর্তমানের তুলনায় ভবিষ্যতেরও কিছু নির্দেশ দিতে হবে। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বিজ্ঞান পড়ে, কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে সাহিত্যের সংগে বিজ্ঞানের অনুবন্ধের অসুবিধা নেই।

সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রবন্ধরচনার উচ্চতম বিকাশ। নিচের ক্লাসের উপকারিতা-অপকারিতাবিচারে সমালোচনবৃত্তির ব্যবহার থাকলেও

পরিপূর্ণ সমালোচনামূলক প্রবন্ধরচনার ক্ষমতা নবম-দশম শ্রেণীর আগে আশা করা যায় না। সমালোচনায় যে যুক্তি ও নিরপেক্ষতার প্রয়োজন তা বালক কেন, পূর্ণবয়স্কের পক্ষেও কঠিন। এইরূপ প্রবন্ধরচনার সময়ে ছাত্রের মন যাতে পক্ষপাতদুষ্ট না হয় সেইদিকে শিক্ষককে দৃষ্টি রাখতে হবে এবং বিভিন্ন মতের পাঠ ও আলোচনাদ্বারা তাদের মনকে প্রস্তুত করতে হবে। যেমন, কোন সাময়িক ঘটনার বর্ণনায় বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক ঘটনার বিভিন্ন বিবৃতির তুলনা উভয়দিগ্‌দর্শনের খুব ভাল প্রস্তুতি। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংবাদপত্রের নির্দিষ্ট অংশ কেটে নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়া যায়। এতে ছাত্রের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত, মতামত পরিপক্ক ও দৃষ্টি উদার হয়।

নির্বস্তুক ভাববিষয়েরও উভয়পক্ষদর্শন ছাত্রের পক্ষে প্রয়োজনীয়। যথা, ভদ্রতা ও বিনয় সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ রচনার সময়ে গুণগুলির প্রশংসার সংগে আতিশয্যের দোষও বলতে হবে ; অথবা "অর্থমনর্থম্" এই প্রবন্ধে পরিমিত অর্থের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিতে হবে।

চিঠিলেখা প্রবন্ধের রূপভেদ। চিঠির প্রকৃতিভেদে এই রচনা ঘটনা, বর্ণনা, জ্ঞান বা আলোচনামূলক হ'তে পারে। অনেক ছাত্র প্রবন্ধের সাহিত্যিক রূপ অপেক্ষা পত্রের বিশ্রব্ধতা সহজ মনে করে।

প্রবন্ধরচনার বিষয়ের যেমন মৌলিক ও চিত্তগ্রাহী হওয়া বাঞ্ছনীয়, তেমনি লিখবার ভংগীও সরস হওয়া চাই। সুলেখকের গুণে যে-কোন বিষয়ই স্থায়ী সাহিত্যের আসন লাভ করতে পারে, প্রবন্ধও গল্পের মত মনোরম হ'তে পারে। তাতেই প্রবন্ধরচনার বাস্তবিক উৎকর্ষ। গল্প লেখার ক্রমবিকাশরূপে প্রবন্ধরচনার অভ্যাস করালে স্বভাবতই ছাত্রের প্রবন্ধে গল্পের সাবলীল ভংগী থাকে, তাছাড়া শিক্ষককে সাহিত্যিক পটভূমিসর্জনেও তৎপর থাকতে হবে। প্রবন্ধের পাঠ যেন সাধারণ জ্ঞানের

পাঠে পর্যবসতি না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে। এর দুয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায়। ষষ্ঠশ্রেণীতে "নদীর আত্মকথা" প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে শিক্ষক বিষয়টিকে চিত্রমানচিত্রাদিসহযোগে ভূগোলের পাঠে পর্যবসিত করতে পারেন। অথবা ভূগোলের উপকরণগুলিকে কাঠামের মত ব্যবহার করে' আলোচনাটিকে সাহিত্যলোকে উত্তীর্ণ করতে পারেন। অনুরূপভাবে শরৎকালবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকৃতিপাঠ হবে, না সাহিত্যরচনা হবে তা শিক্ষকের শিক্ষণের উপর নির্ভর করবে। কাব্যবহুল বাংলাসাহিত্যে প্রায় প্রত্যেক বিষয়েরই প্রত্যেক শ্রেণীর উপযোগী উদ্ধৃতিসংগ্রহ শিক্ষকের পক্ষে কঠিন হবে না; প্রবন্ধের প্রস্তুতিসূত্রে উক্তি সংগ্রহের ভার ছাত্রের ওপরও ন্যস্ত করা যায়। অপরপক্ষে দেখতে হবে প্রবন্ধ যেন কাব্যোচ্ছ্বাসমাত্রে পরিণত না হয়। বস্তুত, ভাবের ঔদার্য ও জ্ঞানের গভীরতার সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয়ই সাহিত্যরচনার আদর্শ।

অন্যান্য রচনার প্রসংগে লিখনশৈলীর বিষয়ে যা বলা হয়েছে প্রবন্ধ সম্বন্ধেও সে-কথা সত্য। এইজন্য সর্বপ্রথমে বিষয়ের আলোচনার ক্রম ও ধারাবাহিকতার রক্ষার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, বিষয়ের অংশগুলি যেন যুক্তিযুক্তভাবে সজ্জিত হয়, এক অংশের আলোচনা সম্পূর্ণ না করে' অন্য অংশ আরম্ভ না করা হয়, বিষয়ের অংশ থেকে অংশান্তরে যাবার সময়ে ভাষা যেন খাপছাড়া না হয়, নূতন অনুচ্ছেদ আরম্ভ করার সময়ে পূর্বানুচ্ছেদের সংগে ভাবের যোগ ছিন্ন না হয়, ইত্যাদি।

তারপর ভাষার সৌন্দর্য। প্রকাশভংগীর সরলতা, প্রাঞ্জলতা ও যুক্তিযুক্ততাই প্রবন্ধরচনার প্রথম প্রয়োজন, তারই দৃঢ়ভিত্তিতে রীতির সৌন্দর্য ও সরসতা আশ্রয় পাবে। এই রীতি ছাত্রের স্বাভাবিক, ব্যক্তিগত রীতি হওয়া চাই। শিক্ষক বা সাহিত্যিকের প্রকাশভংগীর প্রভাব তার ওপর নিশ্চয়ই পড়বে—কিন্তু মুখস্থকরা, কৃত্রিম, অনুকৃত রীতির চেষ্টা সে করবে না।

পরীক্ষা ও ভ্রমসংশোধন

ভ্রমসংশোধন শিক্ষার অস্ত্রস্বরূপ। মনস্তত্ত্ববিদেরা 'প্রচেষ্টা ও ভ্রমের' পদ্ধতিকে (Trial & Error Method) শিক্ষার অন্যতম পন্থা বলে নির্দেশ করেছেন। মানুষ বারে বারে ভুল করতে করতে সেই অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে প্রকৃত পথ খুঁজে পায়। ছোট শিশুর ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করলে এই পদ্ধতি সহজেই চোখে পড়ে। হয়ত কোন রকমে তার দুটি খেলনা একসংগে আটকে গেছে, কি করে' খুলতে হয় সে জানে না, তাই জিনিস দুটিকে ধরে' সে খুব জোরে ঝাঁকাতে থাকে; হয়ত সেই ঝাঁকানির চোটেই খেলনা দুটি খুলে আলগা হয়ে যায়। কিন্তু এতে সে শুধু কাজটা করতে দেরি হয় তা নয়, কাজটা আকস্মিকভাবে হয়ে যাওয়াতে তার পদ্ধতি শিশুর ভাল করে' আয়ত্ত হয় না।

তবু মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও চেষ্টার ক্ষমতা যাতে গড়ে' উঠতে পারে সেইজন্য শিশুকে জ্ঞানের কথাগুলি সোজাসুজি না শুনিয়ে দিয়ে খানিকটা স্বচেষ্টার মধ্য দিয়ে আয়ত্ত করতে দিতে হয়। তাছাড়া চুপ করে' বসে' শোনাটা শিশুর স্বভাববিরুদ্ধ, যে অফুরন্ত প্রাণশক্তির উত্তেজনায় সমস্তক্ষণ একটা কিছু করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে, তাকে চুপ করে' শুনতে বল্‌লে হয়ত একবর্ণও তার মাথায় ঢুকবে না, কিন্তু কাজের মধ্য দিয়ে তথ্যটিকে লাভ করতে হ'লে উৎসাহের সংগে জানবার চেষ্টা করবে। শিক্ষকের সাহায্যের প্রয়োজন এখানেই। নূতন জিনিষ আবিষ্কার করবার সময়ে সন্ধানের সঠিক পন্থা জানা থাকে না বলে' অনাবশ্যক ভ্রান্ত প্রচেষ্টায় সময় নষ্ট করতে করতে প্রকৃত পথ খুঁজে নিতে হয়ঃ শিক্ষক পথনির্দেশ করে'

দিলে কাজটি অনেক সহজ হয়। তবে শিক্ষকের নির্দেশ সত্ত্বেও শিশুর কাজ সম্পূর্ণরূপে নিরবদ্য হয় না, এইখানে শিক্ষককে ভ্রমসংশোধন দ্বারা প্রকৃত পথ দেখিয়ে দিতে হবে।

ছেলেরা সাধারণত যে সব ভুল করে' থাকে সেগুলিকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন, প্রকাশভংগীর ভুল, ভাষার ভুল, ছেদচিহ্ন-প্রয়োগের ভুল, ব্যাকরণের ভুল এবং বানানের ভুল। প্রকাশভংগীর ভুলের মধ্যে ধারাবাহিকতার খণ্ডন এবং অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ও ভাব, লেখা প্রধান। প্রবন্ধের পরিচ্ছেদে অনুচ্ছেদসমূহের সংযোগরক্ষাসম্পর্কে প্রথমোক্তটির উল্লেখ ও আলোচনা হয়েছে এবং রচনার পরিচ্ছেদে অনুচ্ছেদ রচনাশিক্ষার পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। দ্ব্যর্থবোধক ভাষার প্রয়োগ খুব সাধারণ ভ্রম ; এতে ভাবের প্রকাশ ব্যাহত হয় বলে' শুধু বিদ্যালয়ের রচনা বা পরীক্ষার খাতায় নয়, পরবর্তী জীবনেও এই অভ্যাস মানুষের অনেক ক্ষতি করে। এইজন্য এর আমূল সংশোধন আবশ্যক। শিশুকাল থেকে স্পষ্ট ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করতে অভ্যস্ত থাকলে এইরূপ ভুলের সম্ভাবনা কমে' যাবে, তবু মাঝে মাঝে এরূপ যদি ঘটে তবে বক্তব্য বিষয়টি ক্লাসে আবার আলোচনা করিয়ে দিলে ধারণার স্পষ্টতা বৃদ্ধির সংগে ভাষাও অনেক স্পষ্ট হবে।

ভাষার ভুলের মধ্যে চলিত ও সাধুভাষার মিশ্রণ, গুরুচণ্ডালী দোষ, একই ব্যক্তির বিষয়ে "সে" ও "তিনি" এই উভয় পর্যায়ের সর্বনামের প্রয়োগ, বচন ও লিংগের গোলমাল প্রভৃতি প্রধান। এর মধ্যে বচন ও লিংগের ভুল সাধারণত অনবধানতার জন্য হয়ে থাকে তাই এর সংশোধন আলোচনার দ্বারা সহজে সম্পন্ন হয়। 'সে' ও 'তিনি'র গণ্ডগোল কখন অনবধানজনিত ও কখন আঞ্চলিক উচ্চারণজাত হয়। যথা, পূর্ববংগীয় উচ্চারণে চন্দ্রবিন্দুর বিরলতার জন্য অনেকে তিনি' লিখে 'তাহার' শব্দের

ব্যবহার করে। এগুলিও দেখিয়ে দিলে ছাত্রেরা সহজে অতিক্রম করতে পারে।

গুরুচণ্ডালী দোষ এবং চলিত ও সাধুভাষার মিশ্রণ ভাষার ওপর অসম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থেকে উদ্ভূত হয়। নিজের ভাষায় ভরসা না রেখে নোট বই ইত্যাদি মুখস্থ করে' মনে রাখতে না পারার ফলে, আবার কখন-কখন বাংলা ভাষার সংবাদপত্রের "খিচুড়ি ভাষা'র প্রভাবেও এই দোষ ঘটে' থাকে। শিক্ষকের বা বইয়ের ভাষা মুখস্থ না করে' নিজস্ব ভাষার পরিণতির পন্থা অবলম্বন করা গুরুচণ্ডালী দোষ এড়াবার প্রধান উপায়। চলিত ও সাধুভাষার মিশ্রণ এড়ানো অপেক্ষাকৃত কষ্টকর। শুধু বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী নয়, পরিণত বয়স্ক লেখকের মধ্যেও এই দোষ দেখা যায়। শিশুর কথিত ভাষার সংগে বইয়ের ভাষার পার্থক্য এই ভুলের প্রধান কারণ। তাই নিচের শ্রেণীতে পুরোপুরি চলিত ভাষায় লেখাতে আরম্ভ করে' সেই ভাষাকেই ধীরে ধীরে মার্জিত করে' সাধুভাষায় উত্তীর্ণ করা এই ভুলের নিরসনের শ্রেষ্ঠ পন্থা। সাহিত্যে চলিত ভাষার বহুল ব্যবহারের ফলে বর্তমানে চলিত ও সাধুভাষার রূপগত প্রভেদ কেবলমাত্র ক্রিয়া ও সর্বনামের পার্থক্যে পর্যবসিত হয়েছে; বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেও চলিত ভাষার উত্তর গৃহীত হয়, তাই ছাত্রছাত্রীদের সাধুভাষায় লেখার জন্য পীড়ন করা অনাবশ্যক। নিম্নশ্রেণীতে চলিত ভাষার ব্যবহারের পর অপেক্ষাকৃত উচ্চ-শ্রেণীতে (পঞ্চম শ্রেণীর আগে নয়) উঠে শিক্ষক ছাত্রদের স্বেচ্ছাক্রমে চলিত বা সাধুভাষা অবলম্বন করতে দেবেন। দুটি বিষয়ের প্রতি তাঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে, প্রথম,—ছাত্র যেন তার নির্বাচিত রূপটি অবিমিশ্র-ভাবে ব্যবহার করে এবং দ্বিতীয়, যারা চলিত ভাষায় লিখবে তারা যেন শব্দের আঞ্চলিক রূপের প্রয়োগ না করে।

ছেদচিহ্নপ্রয়োগের ভ্রম প্রধানত দুই প্রকারের দেখা যায়।

ছেদচিহ্নের অভাব এবং 'ড্যাশ' চিহ্নের অতিরিক্ত প্রয়োগ। এই বিষয়ের একটি শৈশবস্মৃতির উল্লেখ করি। দুর্ভাগ্য অথবা দুর্মতিক্রমে প্রায় আমার 'দাঁড়ি'র প্রয়োগে ভুল হয়ে যেত, এবং তার সংশোধনের সময়ে শিক্ষক যখন সমস্ত রচনাটি একনিঃশ্বাসে পড়বার চেষ্টায় মুখ রক্তবর্ণ করে' ফেলতেন তখন লজ্জা রাখবার স্থান থাকতনা। ছাত্রের অনুচ্ছেদ রচনার শিক্ষা যদি যথেষ্ট যত্নের সংগে হয়ে থাকে তবে ছেদচিহ্নের ভ্রমের সম্ভাবনা কম হবে। তা-ছাড়া ছেদচিহ্নপ্রয়োগের শিক্ষার একটা ক্রম আছে। নিম্নতম শ্রেণীতে দাঁড়ি আর জিজ্ঞাসার চিহ্ন ছাড়া অন্য কোন প্রয়োগ শেখাবার দরকার নেই। তারপর কমা। এগুলির অভ্যাস পাকা হয়ে গেলে পর প্রয়োজন মত ধীরে ধীরে, অতি সাবধানে অন্যান্য প্রয়োগ শেখাতে হবে। 'ড্যাস'কে চিহ্নরূপে গ্রহণ না করা উচিত। দুয়েক ক্ষেত্রে এর সামান্য প্রয়োগ থাকলেও এর অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা এত বেশি যে ছাত্রদের পক্ষে এর প্রয়োগ বর্জন করাই ভাল।

ব্যাকরণের শিক্ষার দ্বারা ব্যাকরণগত ভুলের সংশোধন সম্ভব নয়। ব্যাবহারিক জ্ঞানই বিশুদ্ধ ভাষারচনার ভিত্তি। অভ্যাসের কতকগুলি প্রক্রিয়ার দ্বারা (রচনার পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) এই ভিত্তি বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণী থেকে স্থাপিত হ'তে থাকে। ব্যাকরণের ভুল হ'লে ব্যবহারের দ্বারা তার সংশোধন করে' দিতে হবে এবং অভ্যাসের দ্বারা সেই সংশোধিত রূপ গেঁথে দিতে হবে এবং যদি লংঘিত সূত্রটি পাঠ্য-ক্রমের মধ্যে থাকে তবে সংশোধন ও অভ্যাসের সময়ে তার প্রতি নির্দেশ করতে হবে।

বানানের ভুলের মধ্যে সাধারণত প্রধান কয়েকটি প্রকার দেখা যায়।

প্রথম, ব্যাকরণসম্বন্ধীয় জ্ঞানের অভাবজাত, যেমন দুরাবস্থা,

ব্যবহারিক, পৌরহিত্য, ভৌগলিক, উপযোগীতা, কৃষিজীবি ইত্যাদি। দ্বিতীয়, উচ্চারণজনিত, যথা, প্রিভিতি (প্রভৃতি), ভাতা (ভ্রাতা), সাহার্য্য (সাহায্য) ইত্যাদি। আঞ্চলিকতাজনিত বিকৃত উচ্চারণের ফলেও (পাঠাভ্যাস ও উচ্চারণশুদ্ধির পরিচ্ছেদ দর্শনীয়) অনেক সময়ে বানান ভুল ঘটে। বিশুদ্ধ উচ্চারণের অভ্যাসের দ্বারা এই দুই শ্রেণীর বানান ভুলের সংশোধন হয়, কিন্তু অনেক প্রকারের উচ্চারণজাত বানানভুল ঘটে যার সংশোধনের উপায় এত সহজ নয়। বাংলা বর্ণমালা সংস্কৃত বর্ণমালার অনুসারী, কিন্তু সংস্কৃত বর্ণের উচ্চারণ বাংলায় অনুসরণ করা হয়না। বাংলার এই উচ্চারণবৈশিষ্ট্যের জন্য বানান ভুল হয়। বাংলায় তিনটি 'শ' এবং দুটি 'জ', 'ই' 'উ' ও 'ব' এর উচ্চারণে পার্থক্য নেই। এর মধ্যে ব-দুটির লেখায়ও পার্থক্য ঘুচে গেছে, কিন্তু বাকিগুলি বহু ভুলের সৃষ্টি করে। এখন সংস্কৃত উচ্চারণে ফিরে গিয়ে এগুলির সংশোধনের চেষ্টা করা বৃথা, কেননা বাংলা উচ্চারণের একটি নিজস্ব পদ্ধতি দাঁড়িয়ে গেছে। যথা—"শিখিসহ শিখিনী সুখিনী" এই অংশে প্রত্যেক শ-এর উচ্চারণ তালব্য; "এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ"—এখানে প্রথমটির উচ্চারণ তালব্য ও পরের দুটির দন্ত্য; "শ্রাবণ শর্বরী"র প্রথমটি দন্ত্য, পরেরটি তালব্য। 'উ'কারের প্রয়োগেও দেখা যায়, দুর্গ, দুর্গা, দুঃখ প্রভৃতির 'উ' এর উচ্চারণ দীর্ঘ; শুশ্রূষার উকারের উচ্চারণ হ্রস্ব কিন্তু মুমূর্ষুর উকারের উচ্চারণ দীর্ঘ। আরো অনেক উদাহরণের উল্লেখ করা যায়, কিন্তু উদ্ধৃত কয়টির মধ্য থেকেই পাঠক লক্ষ্য করবেন যে বাংলায় সংস্কৃত শব্দের অসংস্কৃত উচ্চারণের মধ্যেও কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম আছে। এগুলি বিধিবদ্ধ করা হয়নি বলেই যে পরিত্যাগ করা সম্ভব তা নয়। তৃতীয়ত, সাদৃশ্যজাত ভুল, অর্থাৎ বানানে সাদৃশ্য আছে এমন পৃথক পৃথক শব্দের মধ্যে গোল হ'য়ে যাওয়ার ফলে ভুল, যেমন

কোন শব্দের শেষে 'স্থ' ও কোনটির শেষে 'স্ত' থাকবে বুঝতে না পেরে মুখস্ত, দুর্দশাগ্রস্থ, প্রভৃতি বানান লেখা হয়, বা সমাসে ইন্‌ভাগান্ত শব্দে হ্রস্ব-ই কার হয় বলে' স্ত্রীলিংগ শব্দেও অনুরূপ লেখা, যথা ছাত্রিগণ। ধুলি শব্দে বিকল্পে ধূলি হয় বলে' অনেকে 'ভুল'কেও 'ভূল' লেখে।

একজন ইংরেজ অধ্যাপিকা একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন— "আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের বানান সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকে ; তোমাদের দেশে এমন হয় কেন ?" সত্যই এ বড় লজ্জার কথা, ইংরেজির মত খামখেয়ালি বানানের ভাষায় যদি এটা সম্ভব হয়, তবে আমাদের তা হবে না কেন ?

বস্তুত, বানান ভুল সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই। আমাদের সামাজিক ও সাহিত্যিক পরিবেশ, যথা বিজ্ঞাপন, খবরের কাগজ, বই প্রভৃতি বানান-ভুলে পূর্ণ। বড়রা সর্বদাই বানান ভুল করেন, এমনকি শিক্ষকগণও।

আজ পর্যন্ত বানান ভুলের ব্যাপারে একটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান হ'লনা, সাধারণ বানান ভুলের একটী তালিকা প্রস্তুত হ'লনা।

ভুলের তালিকা করার আগে আবার ঠিকের নির্ণয় প্রয়োজনীয়, এইজন্য বানান বিধিবদ্ধ হওয়া চাই। বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃক গৃহীত বানানবিধি এখনও বিকল্প অবস্থায় বর্তমান ; বানানের অরাজকতার ফলে ছাত্ররা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই রয়ে গেল। এই অবস্থার প্রতিকার করতে হ'লে বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ও সরকারি শিক্ষাবিভাগ থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইয়ে নূতন বানানবিধি অনুসরণ করতে হবে এবং বাহিরের প্রকাশিত যে-সব বইয়ে বানানের নূতন পদ্ধতি অনুসৃত হয়নি সে-গুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাপর্ষৎ ও শিক্ষাবিভাগের নির্বাচিত পাঠ্য, পাঠাগারে রক্ষণীয় বা পুরস্কারের উপযোগী পুস্তকের

তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। এ বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ ও লেখকগণেরও সহযোগিতা করা উচিত। প্রতিভাবান লেখকের পক্ষে বিধান অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই, এই অজুহাত কাজের নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থাদিতে বানানবিধির সংস্কার করেছিলেন। আইন দ্বারা সাইনবোর্ড ইত্যাদিতে এবং সাহিত্যে বানান-ভুল বন্ধ করার কথা বলা হয়ে থাকে কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভবপর বা বাঞ্ছনীয় নয়। বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে বানান বিশুদ্ধির অভ্যাস প্রতিষ্ঠিত হ'লে ভবিষ্যতে সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তনও সহজ হবে।

ব্যাকরণের জ্ঞানের অভাবজনিত বানান ভুল অন্যান্য ব্যাকরণগত ভুলের মত ব্যবহারের দ্বারা সংশোধিত করতে হয়। বিধিবদ্ধ ব্যাকরণ-পাঠ আরম্ভ হবার পর যে-সব সূত্র যে যে শ্রেণীতে পড়া হয়েছে সেই সেই শ্রেণীতে সে-গুলির ব্যতিক্রমে যে ভুল হবে তার জন্য সূত্রের নির্দেশ করা বানান বিশুদ্ধি অর্জনের শ্রেষ্ঠ উপায়।

উচ্চারণজনিত বানান ভুলের মধ্যে কোন কোন ধরনের ভুল যে উচ্চারণশুদ্ধির দ্বারা সংশোধিত করা যায় তার আলোচনা আগে হয়েছে। অন্যগুলি করতে হবে অভ্যাসের সাহায্যে।

সাদৃশ্যজাত বানানভুলের সংশোধন করতে হবে বাস্তবিক আশ্লেষসৃষ্টির দ্বারা, অর্থাৎ, এক ধরণের বানানের একসংগে ব্যবহারে ও তুলনা করে'।

প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকারের বানানের ভুল সংশোধনের অপেক্ষা সেগুলিকে এড়ানোই বানানবিশুদ্ধির প্রকৃষ্টতর পথ, এবং ভুল এড়াবার প্রধান পথ বহু ব্যবহার বহু ব্যবহারের ভিত্তি ভূয়োলিখন, কিন্তু ভূয়োলিখনের অর্থ এই নয় যে প্রত্যেকটি ভুল বানানের বিশুদ্ধ রূপ পাঁচ বা দশবার লেখাতে হবে, এর অর্থ হ'ল সাধারণ ভাবে প্রচুর

লেখানর অভ্যাসদ্বারা বিশুদ্ধ বানানকে পেশিগত স্মৃতির (muscular memory) মধ্যে মুদ্রিত করে' দেওয়া। এই স্মৃতিকে দৃঢ় করার জন্য অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকদেরও সাহায্য করতে হবে। ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি যাঁরা পড়ান তাঁরাও ছেলেদের খাতায় বানান ভুল সংশোধন করবেন, কেবল মাত্র বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবেন না। পেশীর স্মৃতি যে বানান মনে রাখার প্রধান উপায়, বড়দের দিকে লক্ষ্য করলে সেটা বোঝা যায়; তাঁরা বানানের সংশয় হ'লে যখন পাশাপাশি দুইপ্রকার লিখে যেটি দেখতে ভাল লাগল সেটি ব্যবহার করেন, তখনই এই স্মৃতির সাহায্য নেন।

বানান ভুল এড়াবার জন্য বানান মুখস্থ করান উচিত নয়, কেননা, আগ্রহহীন, যান্ত্রিক মুখস্থ স্থায়ী হয় না। শুদ্ধাশুদ্ধের তালিকা দিলেও লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হয়, কারণ তাতে শুদ্ধের সংগে অশুদ্ধরূপটিও স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গণ্ডগোল ঘটাতে পারে। শ্রুতিলিখনের সাহায্যে বানান শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু এ অভ্যাসও বানান মুখস্থ করার রূপভেদমাত্রে পর্যবসিত হয়। লেখনের প্রক্রিয়া হিসেবে শ্রুতিলিখনের মূল্য আছে কিন্তু তা বানানশেখার ক্ষেত্রে অধিক নয়।

বানান শেখার সর্বাপেক্ষা সহজ ও স্থায়ী উপায় হ'ল নানা খেলা ও প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে। এতে ছেলেরা বানান মুখস্থ করে কিন্তু আনন্দ ও উৎসাহের মধ্যে দিয়ে করে বলে' মুখস্থ শীঘ্র হয় এবং বেশিদিন মনে থাকে।

ছাত্রদের মধ্যে বানান ভুলের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। পরিবেশ, বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতির পার্থক্যের ফলে বিশেষ বিশেষ ছাত্র বিশেষ বিশেষ প্রকারের বানান ভুল করে। সুশিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের ভুলের বিশেষত্ব লিখে রাখবেন এবং শব্দ নিয়ে খেলা বা ভ্রমসংশোধনের সময়ে

যার যে ধরনের ভুল বেশি হয় তাকে সেই ধরনের বানানের অভ্যাস করাবেন।

শুধু বানান নয়, সব রকমেরই ভুল এড়াবার জন্য কতকগুলি প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যায়। তাতে ভ্রমের সম্পূর্ণ নিরসন না হ'লেও তার সংখ্যা কমে। রচনাবিষয়ের আলোচনার সময়ে ভাষার বিশুদ্ধি ও স্পষ্টতালাভের অভ্যাসের যে-সকল পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে শিশুকে প্রথম থেকে সেইভাবে শিক্ষা দিলে ভ্রমপ্রমাদবিরল বিশুদ্ধ ভাষা লেখা তার অভ্যাস হয়ে যাবে। এইভাবে শিক্ষা দেওয়া কিছু আয়াসসাধ্য হ'লেও ভ্রম-সংশোধন করবার সময়ে ভ্রমের স্বল্পতা দেখে শিক্ষক নিশ্চয় আনন্দিত হবেন।

প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতির দোষদর্শন করে' বলা যায় যে পরীক্ষার ভয়ে ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ সমাপ্ত করার তাড়ায় শিক্ষকদের এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে তাঁরা তত যত্নের সংগে শিক্ষা দিতে বা প্রশ্নের আলোচনা করতে পারেন না। কিন্তু ছাত্রদের ছোটবেলা থেকে স্বাধীন চিন্তায় ও আলোচনায় অভ্যস্ত করিয়ে রাখলে তাতে মৌলিকতা উদ্বোধিত ও মার্জিত হওয়ার ফলে প্রশ্নের ধারা তারা অল্প সময়ে আয়ত্ত করতে পারে। তাছাড়া প্রত্যেক সম্ভাব্য প্রশ্নের পৃথক আলোচনা না করে' পাঠ্যবিষয়গুলির সাধারণ অথচ পুংখানুপুংখরূপ বিশ্লেষণ করলে যে-কোন প্রশ্নের উত্তর লিখিবার ক্ষমতা ছাত্রের লাভ করে। শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার পূর্বে ছাত্রদের কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করতে বলে' তার মধ্য থেকে প্রশ্ন করা যায় (Prepared Tests)। অবশ্য তারা যাতে মুখস্থ করে' না আসে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

ভ্রম এড়াবার পদ্ধতি যতই সাবধানতার সংগে অবলম্বন করা হয়ে থাকুক না কেন, লিখবার সময়ে কিছু ভুল প্রায়ই ঘটে। সেগুলি কেবল কালি

দিয়ে কেটে না দিয়ে কি ধরনের ভুল হয়েছে তা পাশে লিখে দিলে এবং খাতা ফেরত দেবার সময়ে প্রত্যেক ছাত্রের ভ্রমগুলি পৃথকভাবে আলোচনা করে' দিলে ভাল। ক্লাসের ছাত্রসংখ্যার আধিক্যের জন্য প্রত্যেকের খাতার পৃথক আলোচনা সম্ভব না হয় তবে সাধারণ ভুলগুলির আলোচনা করে' দিয়ে, যাদের বিশেষ সংশোধনের প্রয়োজন তাদের আলাদা ডেকে নিয়ে কথা বলা উচিত। তারপরে ছাত্রদের দিয়ে কাগজে কলমে ভুলগুলির সংশোধন করা চাই।

অনেক সময়ে কোন কোন ছাত্র এত বেশি ভুল করে যে তার সব ভুল একসংগে দেখিয়ে দিলে মনে থাকা সম্ভব নয়। তার খাতার সব ভুল সংশোধিত করলে উপকার হবেনা বলে' একেক করে' সংশোধন করতে হয়। যেটি তার সবচেয়ে মারাত্মক দোষ সেটিদিয়ে আরম্ভ করে' একটি সংশোধিত হ'লে আরেকটি নিয়ে আস্তে আস্তে ভাষার বিশুদ্ধতা শিক্ষা দিতে হয়।

ছাত্রদের ভ্রম যতই কম ঘটুকনা কেন খাতার সংখ্যা অতিরিক্ত বেশি হ'লে শিক্ষকের পক্ষে সেগুলির যথাযথ সংশোধন কঠিন। তাই শুধু নিজের দিকে নয়, ছাত্রের দিকে চেয়েও খাতার সংখ্যা কম করতে হবে। আবার কোন কোন বিদ্যালয়ে এত ঘন ঘন লেখার দিন নির্দিষ্ট করা থাকে যাতে খাতাগুলি ভাল করে' সংশোধন করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে সমগ্র ক্লাসের ছেলেদের উৎকর্ষের তারতম্যানুযায়ী কয়েকটি দলে ভাগ করে' নিয়ে একে দিন একেক দলকে দিয়ে লেখালে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই উপকার হবে। ছাত্রদের যদি দু'ভাগে ভাগ করে' নেওয়া যায় তবে যেদিন একদলের লিখবার পালা সেদিন অপর দলের ভ্রম সংশোধন করা যায়। শ্রেণী তিন দলে বিভক্ত হ'লে ছেলেদের লেখা, ভ্রমসংশোধন ও পরিকল্পনামূলক কাজের (Project) হিসেবে ভাগ করা যায়।

উচ্চতম শ্রেণীতে প্রত্যেকটি ছাত্রকে দিয়ে সকল প্রশ্নের উত্তর না

লিখিয়ে ক্রমান্বয়ে কয়েকটি করে' ছাত্রকে দিয়ে কয়েকটি করে' প্রশ্ন লিখিয়ে সমস্ত শ্রেণীর দ্বারা আলোচনা করালে সকলেরই প্রত্যেকটি প্রশ্ন শেখা হয়ে থাকে। এতে প্রশ্নের উত্তর তৈরি করার ভার ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রের ওপর থাকে বলে' কম পরিশ্রমে কাজ অধিক অগ্রসর হয়।

আগে যে পরিকল্পনামূলক কাজের উল্লেখ করা হয়েছে তার একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। হয়ত শ্রেণীর লেখার কাজের বিষয় "গ্রাম্যজীবন" সম্বন্ধে রচনা ঃ নিচের শ্রেণীতে বাগানে বা বালির পাত্রে গ্রাম তৈরির পরিকল্পনা দেওয়া যায় এবং মধ্যম ও উচ্চশ্রেণীতে গ্রামের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ছবি, কবিতা, গল্প ও নানাপ্রকারের তথ্য সংগ্রহ করতে বলা যায়। বলা বাহুল্য যে মধ্য ও উচ্চশ্রেণীর কাজের মানের তারতম্য থাকবে। কাজের দিনে কাজের জন্য নির্দিষ্ট দলটি, নিচের ক্লাসের হ'লে গ্রাম তৈরি করবে আর ওপরের ক্লাসের হ'লে সংগৃহীত উপাদানে স্বয়ংসঞ্চয়ন, চার্ট ইত্যাদি করবে। এতে ধারণা স্পষ্ট ও বিষয়বস্তুর জ্ঞান গভীর হওয়ার ফলে রচনার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে।

লেখাবার সময়ে ক্লাসকে কয়েক ভাগ ভাগ করা ভিন্ন অন্য পদ্ধতিতে খাতা দেখার কাজ সহজ করা যায়। শিক্ষক মাঝে মাঝে এমন প্রশ্ন দেবেন যার উত্তর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয়। যেমন একটি গল্প পড়িয়ে তার চরিত্রগুলির নাম লিখতে বলা যায়। অথবা কোনো ঘটনা, স্থান বা চরিত্রের বিষয়ে কয়েকটি মন্তব্য করে' যে মন্তব্যটি সত্য তার পাশে চিহ্ন দিতে বলা যায়। রচনার শিক্ষাসম্বন্ধে বিশেষ্যবিশেষণক্রিয়াদি সামঞ্জস্য-পূর্ণভাবে মিলিয়ে দেবার যে প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলিও এর অন্তর্গত। বিচক্ষণ শিক্ষক অনেক প্রকারের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের কৌশল উদ্ভাবন করতে পারবেন। এতে সংশোধনের খুব সুবিধা ; অংক মেলাবার মত সহজে শিক্ষক এর শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয় করবেন, এমন কি শিক্ষক যদি বোর্ডে

ঠিক উত্তর লিখে দেন তবে ছাত্রেরা নিজেরা খাতা বদল করে ভ্রম সংশোধন করতে পারবে। এতে ছাত্ররাও উৎসাহ পায় এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তির একটা নোতুন দিক মার্জিত হয়। এই পরীক্ষা একান্ত বস্তুমূলক বলে' এগুলিকে Object Tests বলা যায়।

ক্লাসের আর বাড়ির কাজের আপেক্ষিক উৎকর্ষাপকর্ষ নিয়ে মতভেদ হয়। ক্লাসে বসে' কাজ করার বিরুদ্ধে অনেকে বলেন যে নির্দিষ্ট সময়ের তাড়াহুড়োর মধ্যে রচনা কখনও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠতে পারে না; কিন্তু একঘণ্টায় প্রশ্নের আলোচনা করে' অপর কোনো সময়ে তার উত্তর লেখান হ'লে এই দোষের অনেকটা ক্ষালন হয়। তাছাড়া বাড়িতে বসে' প্রচুর সময় নিয়ে লিখতে অভ্যস্ত থাকলে ছাত্রদের শুধু যে পরীক্ষার সময়ই বিপদে পড়তে হয় তা নয়, তাড়াতাড়ি কাজেরও অভ্যাস হয় না।

বাড়ির কাজের জন্য ছাত্রকে অনেকটা বিশ্বাস করতে হয়। বাড়িতে যে কাজটা হয়েছে সেটা তার স্বচেষ্টাকৃত কিনা সে বিষয়ের দায়িত্ব তারই ওপর ন্যস্ত করা থাকে। তাছাড়া, বাড়ির কাজের জন্য যদি কোনো সময় নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে তাহ'লে সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজটা করা হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে ছাত্রের মুখের কথা ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ থাকে না। এইজন্য দায়িত্বজ্ঞান হওয়ার বয়সের আগে বাড়ির কাজ না দেওয়া ভাল। নিচু ক্লাসে বাড়ির কাজ দেওয়ার অবাঞ্ছনীয়তার আর-একটি কারণ এই যে, সারাদিন বিদ্যালয়ে আবদ্ধ থাকার পর বাড়ির কাজ ছোট শিশুদের পক্ষে অতিরিক্ত হ'তে পারে।

বাড়ির ও ক্লাসের কাজ উভয়ের যখন উৎকর্ষাপকর্ষ দুই রয়েছে তখন সমানভাবে দুটি মিলিয়ে করাই ভাল, কেবল নিচের ক্লাসে বাড়ির কাজ দেওয়া অবাঞ্ছনীয়।

কোন্ কোন্ কাজ ক্লাসে আর কোন্ কোন্ কাজ বাড়িতে করার বেশি

উপযোগী তা মোটামুটিভাবে নির্দেশ করা যায়। ছাত্রদের বিদ্যালয়ের দৈনিক পড়া বাড়িতে বসে করতে হয়, পরীক্ষার পড়া বাড়িতে শিখতে হয়। তাছাড়া যেগুলি সময়সাপেক্ষ, অথবা নির্জনে বসে' ভেবেচিন্তে করতে হয় এমন কাজ বাড়ির উপযোগী, যেমন হাতের লেখা, অনুলেখন, স্বয়ং সঞ্চয়ন, কবিতা বা গল্প জাতীয় কোন মৌলিক রচনা, ইত্যাদি। অন্যান্য ধরনের লেখার অভ্যাসও বাড়িতে করতে দেওয়া যায়, তবে ক্লাসেই বেশির ভাগ করা ভাল, কেননা তাতে অবস্থার সামান্যের জন্য রচনার মানেরও কিছু সাম্য থাকে। অংক ইত্যাদি বিষয়ের পক্ষে যেমন অভ্যাস রাখার জন্য বাড়ির কাজ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বাংলায় তেমন নয় বলে' এবং শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলা লেখার অভ্যাস অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও ঘটে বলে' বাড়ির কাজের পরিমাণ কিছু কম করা যেতে পারে।

খাতার সংশোধন লাল কালিতেই করা উচিত, কেননা কালো লেখার মধ্যে লাল সহজে চোখে পড়ে। ছাত্রদের কালো, রয়াল ব্লু কিংবা ব্লু-ব্ল্যাক ভিন্ন অন্য রঙের কালি ব্যবহার করা ভদ্রতাসংগত বলে' মনে করা হয় না, তাছাড়া বেগুনী, সবুজ প্রভৃতি কড়া রং দৃষ্টিকটুও বটে। শিক্ষক ছাত্রের কাছে যেমন পরিষ্কার কাজ আদায় করবেন, তেমনই তাঁর সংশোধনও পরিষ্কার হওয়া চাই।

সংশোধন সহানুভূতির সংগে করতে হবে, কেননা শিক্ষকের রাগের ভয়ে ছাত্রের উপকারের চেয়ে অপকার বেশি হয়,—সে শিক্ষকের প্রতি আস্থা হারাতে পারে, মনের উত্তেজনাবশত তার ভুলের সংখ্যা বেড়ে যেতে পারে, এমন কি পড়াশোনার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মানও আশ্চর্য নয়।

পক্ষপাতশূন্যতা শিক্ষকের নিতান্ত প্রয়োজনীয় গুণ। পক্ষপাত সব সময়ে স্বেচ্ছাকৃত হয় না। শিক্ষকের খাতা দেখার সময়কার মনের ভাবের অনুযায়ী নম্বরের তারতম্য ঘটতে দেখা যায়, তাই শিক্ষকের একেক দলের

খাতা যতদূর সম্ভব একই সময়ে দেখা উচিত। মন বা শরীর খারাপ থাকলে, সেই সময়ে খাতা না দেখাই ভাল। অনেকসময়ে মেধাবী ছাত্রের প্রতি প্রীতিবশত শিক্ষকের নিজেরই অজ্ঞাতসারে পক্ষপাত ঘটে। এজন্য তিনি খুব সাবধান থাকবেন, এবং যতদূর সম্ভব খাতাগুলির তুলনা করে' মনে একটি আদর্শ স্থাপিত করে' সেই অনুযায়ী নম্বর দেবেন।

নম্বর দেওয়ার পদ্ধতি সাংখ্যিক না হয়ে স্তরগত হওয়া উচিত, অর্থাৎ দশ বা পঁচিশের মধ্যে আট, সাত, পনেরো কুড়ি ইত্যাদি নম্বর না দিয়ে রচনাগুলিকে 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' প্রভৃতি শ্রেণিভুক্ত করলে তাতে সুবিচারের সম্ভাবনা বেশি।

ব্যাকরণ

ব্যাকরণ ভাষার মেরুদণ্ড হ'লেও ভাষাশিক্ষার মেরুদণ্ড হ'তে পারে না। কিন্তু ভাষাজ্ঞানের জন্য ও রচনার বিশুদ্ধতার জন্য ব্যাকরণ শিক্ষা প্রয়োজনীয়। বিশুদ্ধ রচনা ও ভ্রমসংশোধনের জন্য কোন স্তরে, কি ভাবে ব্যাকরণের ব্যবহার হ'তে পারে সে-কথা তত্তৎ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

সকল শিল্পেরই মূলীভূত বিজ্ঞান থাকে এবং তার নির্ভুল জ্ঞানের ওপর সেই শিল্পের পূর্ণপরিণতি নির্ভর করে। ব্যাকরণ সাহিত্যকলার অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান ও বিশুদ্ধ, সুন্দর সাহিত্যালোচনার পরিপোষক।

উপযুক্তভাবে পরিবেশন করলে ভাষার এই বিজ্ঞান ছেলেদের ভাল লাগে। তারা সজীব, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী নিয়ে ভাষার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং বৌদ্ধিক যন্ত্ররূপে ভাষার প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ভাষার প্রতি এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভাষাজ্ঞানের মানোন্নয়নের সহায়ক।

ব্যাকরণ শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে তার শিক্ষাপদ্ধতির ওপর। ভাষার উদ্ভবের সময়ে মানুষ সচেতনভাবে নিয়ম তৈরি করে' কথা বলতে আরম্ভ করেনি। যে বিশেষত্বগুলি স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী ভাষায় এসেছে, পরে সেগুলিকে লক্ষ্য করেই সূত্র গাঁথা হয়েছে। শিশুকে শিক্ষা দেবার সময়ে ভাষা ও ব্যাকরণের সেই সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা গ্রহণ করতে হবে।

বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণী থেকে ব্যাকরণের পাঠ সুরু হয় না। তৃতীয় শ্রেণীতে সামান্য সূত্রপাত করে' চতুর্থ শ্রেণী থেকে ব্যাকরণ পড়ান হয়ে থাকে এবং পঞ্চম শ্রেণী থেকে ব্যাকরণের পৃথক পাঠের ব্যবস্থা হয়।

ব্যাকরণের সংগে শিশুর এই পরিচয় ধীরে ধীরে হওয়া চাই। প্রথম যখন সে ব্যাকরণ শিখবে তখন কেবল কথাবার্তার মধ্য দিয়ে শব্দগুলির বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। কিন্তু এই জ্ঞান যেন কেবল শিক্ষকের উপদেশ থেকে না পেয়ে শিশু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করতে পারে ; অর্থাৎ সহজ বা প্রত্যক্ষ পদ্ধতি অবলম্বন করে' তাকে ব্যাকরণ শেখাতে হবে।

নিয়ম ও সূত্র শেখাবার আগে মূলীভূত সত্যগুলি শিশুকে দিয়ে আবিষ্কার করিয়ে নিতে হবে। সে নিজেই লক্ষ্য করতে পারবে যে শব্দ-সমূহের মধ্যে কতকগুলি 'নাম' বোঝায়, কতকগুলি 'কাজ' বোঝায়, কতক-গুলি 'গুণ' বর্ণনা করে, কতকগুলি শব্দ অন্য শব্দের 'বদলে' বসে, কতক-গুলি অন্য দুই শব্দের মধ্যে যোগ স্থাপন করে, ইত্যাদি, কিন্তু এখনই তাদের নাম শিখবার দরকার নেই। শিশুরা এগুলি খেলার মধ্য দিয়ে শিখবে। এর জন্য ছবি ও লেখায় মিলিয়ে চার্ট তৈরি করা যায়। একেকটি বড় বড় কাগজে বড় বড় অক্ষরে কতকগুলি করে' বাক্য লেখা রইল, তার মধ্যে বিশেষ্য-বিশেষণাদি যে সব শ্রেণীর শব্দের প্রতি শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাওয়া হচ্ছে সেগুলি কোন বিশেষ রঙে লিখতে হবে এবং ছবির সাহায্যে প্রত্যক্ষ করতে হবে এবং শ্রেণীর ছেলেদের নাম, গুণ, কাজ ইত্যাদির উদাহরণের সাহায্যে এই প্রত্যক্ষ লব্ধ জ্ঞানকে পরিপূর্ণরূপে বাস্তব করতে হবে। এমনি করে' একেক শ্রেণীর শব্দের জন্য চার্ট করা যায় এবং বোর্ডে লিখে পড়াবার সময়ে রঙিন খড়ির ব্যবহার করা যায়। রচনাশিক্ষার প্রসংগে যে সমস্ত প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে তার দ্বারাও ব্যাকরণের জ্ঞানের ব্যাবহারিক ভিত্তি স্থাপিত হয়।

ক্রমে শিশু বাক্যের গঠনের সংগে পরিচিত হবে। সে নিজেই বুঝতে পারবে যে শব্দের বিশেষ সমষ্টিতে অর্থবোধ হয় এবং তার জন্য কয়েকটি

বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর বাক্য থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দ বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত করে' দেখালে এ সম্বন্ধে শিশুর প্রত্যক্ষ উজ্জ্বল হবে। তারপর শিশু বাক্যরচনার ও সন্নিবেশের নানা বিশেষত্ব লক্ষ্য করতে পারবে; এই জ্ঞানের জন্যও প্রত্যক্ষ পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে। বাক্যগুলি ভেঙে ভেঙে তার ভিন্ন ভিন্ন অংশ দেখান যেতে পারে। যেমন "রাম যদুকে মেরেছে" এই বাক্যটিকে অবলম্বন করে'— "এখানে কি কাজ হচ্ছে?"—"কাজটা কে করছে?"—"কাকে নিয়ে করছে"— ইত্যাদি প্রশ্ন করা যেতে পারে। শ্রেণীর ছেলেপিলেদের নাম ও কার্যকলাপ নিয়ে এই আলোচনা অগ্রসর হ'লে তাদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক ও আগ্রহজনক হবে। কিন্তু এখনও বিশেষ বিশেষ অংশের ব্যাকরণগত নাম বলবার দরকার নেই।

ভাষার কার্যকর ব্যাবহারিক জ্ঞান লাভ করবার পর প্রকৃত ব্যাকরণ শিক্ষার সময় আসে। তখন সূত্রনিয়মাদি আয়ত্ত করা সহজ হয়। পঞ্চম শ্রেণী থেকেই ধীরে ধীরে ব্যাকরণের জ্ঞানকে এই উন্নততর পর্যায়ে পরিচালিত করা যায়, কিন্তু এ সময়ে যাতে ছাত্রের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বহির্ভূত কোনো শিক্ষা না দেওয়া হয় সে বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে। সূত্রনিয়মের জ্ঞানকে পরীক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, উদাহরণের পর উদাহরণ ছেলেদের সামনে তুলে ধরতে হবে। বাক্যের পর বাক্য ভেঙে ভেঙে দেখাতে হবে. এলোমেলো, উল্টোপাল্টা বাক্যকে সোজা করে' সাজাবার অভ্যাস করাতে হবে। এ সমস্তই পূর্বজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত, কেবল নাম ও সংজ্ঞাগুলি নোতুন। নামের অর্থ যতদূর সম্ভব বুঝিয়ে দিলে সেগুলি মনে রাখতে ছেলেদের অসুবিধা হবে না, তাছাড়া প্রথম থেকে নাম মনে রাখার জন্য বেশি জোর করার দরকার নেই, সেটা আস্তে আস্তে অভ্যাসের দ্বারা হবে। সংজ্ঞাগুলি মোটামুটিভাবে ছেলেদের গড়ে' নিতে হবে, পরে

শিক্ষক সেগুলি মার্জিত ও সংশোধিত করে' দেবেন। যেমন, বিশেষ্যের সংজ্ঞা ছাত্র নিজেই বলতে পারবে, যে বিশেষ্য বস্তু, ব্যক্তি, গুণ ইত্যাদির নামকে বোঝায়, পরে শিক্ষকের সাহায্যে মার্জিত হয়ে সেটাই পূর্ণ সংজ্ঞায় পরিণত হবে। সংজ্ঞাগঠনের ভ্রম হ'লে শিক্ষক উদাহরণ ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে কারণ প্রদর্শন করে' ভ্রমসংশোধন করবেন।

এই পদ্ধতি বিশেষ (উদাহরণ) থেকে সাধারণে (সূত্র) উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলনীতি রক্ষা করে এবং মানুষের আবিষ্কার ও জ্ঞানলাভেরও এই প্রধান পন্থা। একে আরোহ-পদ্ধতি বলা হয়।

উঁচু ক্লাসেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করে' শেখান হ'লে ছাত্র ব্যাকরণ বিভীষিকার হাত থেকে রক্ষা পাবে। বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত চার্ট, ব্ল্যাকবোর্ড ও উদাহরণের সাহায্যে ছাত্রের নিজের অভিজ্ঞতার অবলম্বনে ব্যাকরণ শিক্ষা সম্ভব। যে-কোন বিষয়েই হোকনা কেন, শিক্ষককে প্রচুর পরিমাণে উদাহরণ সংগ্রহ করতে হবে এবং তার মধ্য থেকে ছাত্র বিশেষ বিষয়টিকে নিজে আবিষ্কার করে' নিতে পারবে।

উদাহরণস্বরূপ বাংলার বিশিষ্ট বাক্যভংগীর কথা বলা যেতে পারে। শিক্ষক যে-কটি বিশিষ্ট ভংগী শিক্ষা দিতে চান তার প্রত্যেকটিকে অবলম্বন করে' কয়েকটি বিভিন্ন বাক্য রচনা করবেন। এরজন্য চার্ট তৈরি করা যেতে পারে; যদি প্রত্যেকটি বিশিষ্ট ভংগী অবলম্বন করে' বিভিন্ন বাক্য রচনা করা যায় তবে শিক্ষক একেকটি ভংগীর উদাহরণ সমন্বিত বিভিন্ন পাঁচটি বাক্য নিয়ে একেকটি 'চার্ট' পরিষ্কার করে' লিখবেন, এর থেকে ছাত্র নিজেই বিশিষ্ট ভংগীটির অর্থ বুঝতে পারবে। তারপর পুনরালোচনা ও প্রয়োগের সময়ে শিক্ষক লব্ধজ্ঞানের অভ্যাস ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন। যে চার্ট ব্যবহার করা হবে তাতে বাক্যগুলির অন্যান্য অংশ কালো কালিতে লিখে বিশেষ অংশ লাল বা অন্য কোনো রঙিন

কালিতে লেখা যায়, যথা 'সোনার সোহাগা' এই কথাটিকে অবলম্বন করে' যদি চার্ট করা যায় তবে বাক্যগুলির অন্য অংশ কালো কালিতে আর 'সোনায় সোহাগা' লাল কালিতে লিখতে হবে। এতে লব্ধজ্ঞানের স্মৃতি ছাত্রদের মনে স্থায়ী হ'তে সাহায্য করবে।

যে-সব উদাহরণের ব্যবহার করে' ব্যাকরণ পড়ান হবে সেগুলি যতদূর সম্ভব ছাত্রদের পঠিত সাহিত্যাংশ থেকে উদ্ধৃত করা হবে এবং তাদেরও উদাহরণ সংগ্রহ করতে উৎসাহিত করতে হবে। পরিচিত উদাহরণের সাহায্যে জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হ'লে পর বাইরের নানা উদাহরণ দিয়ে সেই জ্ঞানকে পরিপক্ব করতে হবে। উদাহরণ যেন সাহিত্যিক হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে।

বস্তুত এই পদ্ধতির ব্যবহারে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়কে কষ্ট করে' বহু উদাহরণ সংগ্রহ করতে হবে এবং শিক্ষককে ধৈর্যের সংগে ছাত্রের নিজের আবিষ্কারের জন্য অপেক্ষা ও সাহায্য করতে হবে; এতে সময় বেশি লাগবে, কিন্তু শিক্ষা গভীর ও নির্ভুল হওয়ার ফলে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই উপকার হবে। উপরন্তু ভাষা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও সাধনার মনোবৃত্তি সৃষ্ট হবে।

ব্যাকরণের শিক্ষা দেবার সময়ে বাংলার প্রাকৃত প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। ব্যাকরণের অনেক পরিচ্ছেদ পড়াবার সময়ে শিক্ষক লক্ষ্য করবেন যে বাংলা ভাষা হুবহু সংস্কৃতের অনুযায়ী নয় এবং একেবারে বিশুদ্ধ সংস্কৃতের নিয়মানুযায়ী বাংলা পড়ান যেতে পারেনা। কারক, বিভক্তি, সমাস, প্রত্যয়, বিশিষ্ট ভংগী প্রভৃতি যাই শেখান হ'কনা কেন, কেবলমাত্র সংস্কৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞা ও উদাহরণমালা দিলে চলবেনা, খাঁটি বাংলার প্রাকৃত শব্দ থেকেও উদাহরণ দিতে হবে। সম্প্রতি কয়েকটি ব্যাকরণের বইয়ে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে, এটা সুখের কথা,

কিন্তু এদিকে আরো বেশি দৃষ্টি পড়া উচিত এবং সম্পূর্ণ প্রাকৃত বাংলার ব্যাকরণ রচিত হওয়া উচিত।

অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকের মত ব্যাকরণের পাঠ্যপুস্তকও যে কণ্ঠস্থ করার বস্তু নয় একথা সর্বদা মনে রাখতে হবে। ছাত্রদের পাঠের জন্য কোন বই নির্দিষ্ট করে' না দিয়ে শিক্ষকের সংগৃহীত জ্ঞান ও নিজেদের অভিজ্ঞতা অবলম্বনে 'নোট' তৈরি করতে উৎসাহিত করা উচিত। শিক্ষককে অবশ্য নিজের সুবিধার জন্য বই রাখতে হবে; তবে তাঁর একটি বইয়ের ওপর নির্ভর না করে' একাধিক বই অবলম্বনে পড়ান উচিত।

অনেকে বলেন যে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ব্যাবহারিক জ্ঞানের অপেক্ষা উচ্চতর কোন ব্যাকরণ পড়ান উচিত নয়। এ বিষয়ে মতদ্বৈধ অবশ্যম্ভাবী এবং সমাধান বহু আলোচনা ও সময়সাপেক্ষ। যতদিন শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক এর মীমাংসা না হয় ততদিন ব্যাকরণ পড়াতে হবে এবং ব্যাকরণ শেখানর পদ্ধতির আলোচনার প্রয়োজনও থাকবে।

ব্যাকরণ পড়ানর পক্ষে এ-কথা বলা যায় যে বিদেশীভাষার ক্ষেত্রে যেমন ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত হওয়াই যথেষ্ট, মাতৃভাষায় সেরূপ হওয়া উচিত নয়; বিশেষত যখন শিক্ষার নোতুন পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষাশেষের বয়স ১৬+কি ১৭+ধার্য করা হয়েছে এবং এই শিক্ষাকেই অধিকাংশের সাধারণ শিক্ষার শেষমান বলে' গ্রহণ করা হয়েছে, তখন বিদ্যালয়ত্যাগের পূর্বে ছাত্রদের মাতৃভাষার কিছুটা গভীর জ্ঞান অর্জন করা উচিত।

অপরপক্ষে বর্তমান স্কুলফাইন্যাল পরীক্ষার জন্য যেরূপ সূত্রনীতি-কণ্টকিত বিরাট ব্যাকরণপাঠ নির্ধারিত হয়েছে তার যে পরিবর্তন আবশ্যক তাতে সন্দেহ নেই।

ভাষা, সাহিত্য ও ব্যাকরণ

ভাষাশিক্ষার উপাদান সাহিত্য, সাহিত্যের বাহন ভাষা এবং ভাষা-বিশুদ্ধির সহায়ক ব্যাকরণ। এই তিনটি নিকট সম্পর্কযুক্ত অংশের সম্বন্ধ বর্তমান পরিচ্ছেদে আলোচ্য।

শিশু যখন প্রথম বিদ্যালয়ে আসে এখন তার বাংলাশিক্ষা বিশুদ্ধ ভাষার ব্যবহারশিক্ষা। এই শিক্ষা সে কথাবার্তা, খেলা ও কাজকর্মের মধ্য দিয়ে লাভ করে, ব্যাকরণের সূত্রের সাহায্যে নয়। এ দিক দিয়ে বলা যায় যে বিদ্যালয়ের এই স্তরে ব্যাকরণশিক্ষার স্থান নেই এবং চতুর্থ শ্রেণীর পূর্বে তার পৃথক ব্যবস্থাও থাকেনা। অপরপক্ষে ভাষাবিশুদ্ধির শিক্ষার মধ্যে ব্যাকরণিক নীতিসমূহের অভ্যাস নিহিত থাকে (রচনা ও ব্যাকরণের পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) বলে' সে-গুলির সংগে পরিচয় তখন থেকেই ঘটে।

ভাষার ব্যাবহারিক শিক্ষার সংগে "পুস্তকহীন" শিক্ষাপদ্ধতির বিবর্তন হয়েছে এবং "ভাষাশিক্ষার প্রথমস্তরে সাহিত্যের প্রয়োজন নেই"—এমন একটি অভিমতও গড়ে উঠছে। যেমন ব্যাকরণের তেমনি সাহিত্যের মধ্য দিয়েও ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা ক্রমশ অগ্রাহ্য হচ্ছে। কিন্তু শিশুর কাছে ভাষার প্রয়োজন, শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত যন্ত্রমাত্র হিসেবে নয়, তার সাহিত্যের তাগিদ আদিম ও প্রাথমিক রসানুভূতির প্রেরণায়। তার ভাষা-বোধের প্রথমাবস্থায় সাহিত্যবোধ হয়না বলে' মনে করাও ভুল, কেননা, ভাষার সম্পূর্ণ অর্থবোধ না হ'লেও সাহিত্যের সৌন্দর্য তাকে স্পর্শ করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "জীবনস্মৃতিতে"তে বর্ণনা করেছেন যে তিনি অতি

অল্পবয়সে সংস্কৃত কাব্যের অর্থ না বুঝেও শুনতে ও পড়তে ভাল বাসতেন এবং উপনয়নের সময়ে গায়ত্রীমন্ত্র তাঁকে এমনই অভিভূত করেছিল যে তিনি অশ্রুপাত করেছিলেন। সাহিত্যবোধ শিশুমনে অন্তর্নিহিত থাকে এবং অল্পবয়সী শিশুর পক্ষে ছেলেভুলোনো ছড়া সাহিত্যরূপে উপযোগী। দুই বৎসর বয়স অথবা তার আগেও শিশু দু'চার ছত্র ছড়ার আবৃত্তি করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "জীবনস্মৃতি"তে বলেছেন যে যেদিন তিনি প্রথম পড়লেন "জল পড়ে, পাতা নড়ে"—সেদিন সেই দুটি সমিল ছত্রের কাব্য সারাদিন ধরে' তাঁর মনে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল। সম্ভবত এই সত্যানুভূতির ফলেই তিনি "সহজপাঠ" গদ্যেপদ্যে শিশুমনের ধ্বনিসাম্যের এ তৃষ্ণা মেটাবার প্রচুর অয়োজন করেছেন।

শিশুকে পড়তে শেখানর প্রসংগে সাহিত্যপাঠের আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষার প্রথমস্তরে ব্যবহারদ্বারা ভাষাশিক্ষা হ'লেও নিরংকুশ সাহিত্যপাঠ তার পাশাপাশি চলে' ওই শিক্ষাকে সরস, সফল ও গভীর করবে এবং পাঠ্যপুস্তকের স্তরে পৌছেও সাহিত্যপাঠ পাঠ্যের পৃষ্ঠায় আবদ্ধ না থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত হবে। অথচ আমাদের বিদ্যালয়ে সাহিত্যপাঠ অবহেলিত। পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার সংকীর্ণ ও দ্রুত পাঠ অপ্রচুর।

বস্তুত সাহিত্যপাঠ সাহিত্যেরই পাঠ হওয়া চাই, ব্যাকরণ বা ভাষার ব্যবহারমাত্র নয়। এইজন্য সাহিত্যপুস্তক পড়াতে গিয়ে শিক্ষক ব্যাকরণের নিয়ম বা শব্দার্থের মধ্যে জড়িয়ে পড়বেননা। অর্থবোধ ব্যাহত হ'লে নিতান্ত প্রয়োজনীয় আলোচনামাত্র করবেন। শিক্ষক জিজ্ঞাসা করতে পারেন, যদি ভাষার ব্যবহারশিক্ষা ও বিশুদ্ধিলাভের জন্য সাহিত্যের প্রয়োজন না থাকে তবে শিক্ষাক্ষেত্রে সাহিত্যের স্থান কোথায়? পূর্ব-উল্লিখিত আত্মিক

প্রয়োজন ভিন্ন ভাষাশিক্ষার উৎকর্ষের জন্য ও সাহিত্যালোচনার প্রয়োজন আছে ; প্রথমত সাহিত্য ভাষাশিক্ষার আনন্দ ও আগ্রহের সঞ্চার করে এবং দ্বিতীয়ত, কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ভাষার ব্যবহারশিক্ষা আর সাহিত্য-প্রাণস্পৃষ্ট ভাষাশিক্ষার প্রভেদ—"শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে" আর "নীরসো তরুবরঃ পুরতো ভাতি" র প্রভেদের অনুরূপ।

সাহিত্যপাঠ নিচের শ্রেণীতে বিশুদ্ধ আবেগজনিত আনন্দস্বরূপ, কিন্তু ওপরের শ্রেণীতে আলোচনা (criticism) ও অনুভবের (appreciation) পর্যায়ে উন্নীত। বিদ্যালয়ের ছাত্রের সাহিত্যালোচনার মধ্যে সমালোচনা অপেক্ষা অনুভবের প্রাধান্য, অথবা অনুভব থেকে সমালোচনায় তার গতি। কেননা, বালক যখন তার পঠিত সাহিত্যকে মনে মনে যাচিয়ে নিতে চায় তখন তার অপরিপক্ক বিচারশক্তি ও সাহিত্যবুদ্ধি দিয়ে সত্যকারের মহৎ সাহিত্যের সমালোচনা কঠিন হলেও রসানুভূতি সম্ভব।

অনুভব মানবমনের স্বাভাবিক বৃত্তি। আদি আর্য যখন জলে, স্থলে, অগ্নিতে, ওষধিতে, বনস্পতিতে, দেবতার অনুসন্ধান করছিল, তখন তার মধ্যে যুক্তি, তর্ক, বিচার প্রভৃতির চেয়ে অনুভূতির বোধই প্রধান ছিল ; ব্রহ্মজিজ্ঞাসা তার পর। সাহিত্যের অর্থ বুঝবার আগে এই অনুভূতিই শিশুকে তার প্রভাবের বশবর্তী করে' ফেলে। এইজন্য ছেলেভুলোনো ছড়া বড়দের কাছে কখন কখন অসংবদ্ধ হ'লেও শিশু তাকে পরম বিস্ময়কর বলে' মনে ভাবে। তারপর ওই নিম্নতম ধাপ থেকে সাহিত্যানুভবের সোপানে সোপানে তাকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পাদপীঠতলে উপনীত হ'তে হবে।

নিম্নশ্রেণীর শিশুর সাহিত্যানুভূতি জাগ্রত করাই শিক্ষকের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন কাজ। এ জিনিষ যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণিত করা যায় না, প্রদীপ থেকে প্রদীপ জ্বালার মত হৃদয় থেকে হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। শিক্ষকের

সাহিত্যানুরাগ গভীর না হ'লে এই প্রভাব তিনি বিস্তার করতে পারেননা। এইরূপ সঞ্চার সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে কঠিন, কিন্তু শিশুসাহিত্যবিষয়ে কঠিনতম ; কেননা এমন শিক্ষক দুর্লভ যিনি পূর্ণবয়সের পরিপক্কতাকে অতিক্রম করে' শিশুসাহিত্যের রাজ্যে শিশুর সমান অনুভূতি ও বিশ্বাস নিয়ে অবতীর্ণ হ'তে পারেন

পূর্বে বলা হয়েছে শব্দার্থ-ব্যাকরণ-কণ্টকিত সাহিত্যপাঠ একটা প্রক্রিয়ামাত্র, সাহিত্যানুভবের পরিপোষক নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে অনুভবের জন্য অর্থবোধের প্রয়োজন প্রধান নয়, কেননা,—"জগতে না বুঝিয়া পাইবার রাস্তা সকল সময়েই সকলের চেয়ে বড় রাস্তা।" প্রত্যেক শব্দের অর্থ বুঝে পাঠ করাকে তিনি "শিক্ষার হিসাবে জমাখরচ" খতানর মত বলেছেন এবং "সংসারের পাড়ায় হাটবাজার" এর সংগে তুলনা করেছেন। অনুভবকে তিনি সমুদ্রের তীরে বা পর্বতের শিখরে দাঁড়িয়ে মানবমনের অপার মহিমাবোধের সংগে তুলনা করেছেন।

সাহিত্যের ইতিহাসের সংগে পরিচয় সাহিত্যানুভবের অপর অংগ। নদীর মত বহমান সাহিত্যের ধারার পরিচয়ে মানবহৃদয়ের সংগে তার নিগূঢ় যোগস্থাপন সম্পূর্ণ হয়। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাভাষার বিদ্যালয়পাঠ্য সাহিত্যপরিচয় সেই বললেই হয়।

বিদ্যালয়ের পুস্তকাগার সাহিত্যের সংগে যোগস্থাপনের তীর্থ। শিক্ষক সেখানে পূর্ণ সফলতালাভে ছাত্রকে সাহায্য করবেন। কোন কোন বিদ্যালয়ে সাধারণ পুস্তকাগার ভিন্ন শ্রেণীর আলাদা পুস্তকসংগ্রহ থাকে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছাত্রদের ওপর ন্যস্ত থাকে ; এতে বইগুলির যত্ন করে' এবং সেগুলি সহজে হাতে পেয়ে তাদের সাহিত্যানুশীলনের সুযোগ ও ইচ্ছা অধিক হয়।

ছাত্রদের উৎসাহবৃদ্ধির জন্য শিক্ষককে শ্রেণী ও বিদ্যালয়ের পুস্তকাগারের

সংগে ঘনিষ্ঠ যোগ রাখতে হবে এবং ছোটদের উপযোগী সাহিত্যের আধুনিকতম পরিণতিসমূহের সংগে পরিচয় রেখে ক্রমাগত পুস্তকসংখ্যা বাড়াতে হবে। তাছাড়া তাঁকে ছাত্রদের পাঠের ক্রমনির্দেশ করে' সাহিত্যালোচনা সফল করতে হবে। তিনি ছাত্রদের দ্বারা পঠিত বইয়ের সমালোচনা লিখিয়ে সেগুলি শ্রেণীতে পড়িয়ে বা বিদ্যালয়ের পত্রিকায় প্রকাশ করিয়ে তাদের উৎসাহ দেবেন।

ছাত্রদের সাহিত্যপাঠের উপযোগী মনোবৃত্তি গঠন করাও শিক্ষকের দায়িত্ব। বিশেষত আজকালকার বহুল প্রচারিত রোমাঞ্চ সাহিত্যের প্রলোভন এড়াবার মত সাহিত্যবোধ যেন এদের মধ্যে তিনি জাগ্রত করতে পারেন। দেখা গেছে যে ছেলেপিলেরা বাস্তবিক সাহিত্যের আস্বাদন একবার পেলে ওই জোলো, খেলো, মোদো জিনিষের পেছনে যায়না। এই বোধশক্তি শিক্ষকই উদ্বোধিত করবেন।

তারপর, কেবল গল্প, কবিতা ও নাটক নয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যাতে প্রবন্ধ, ভ্রমণ, জীবনী, সমালোচনা ও নানা জ্ঞানবিজ্ঞানবিষয়ক বইও পড়ে সাহিত্যশিক্ষক তার ব্যবস্থা করবেন। পূর্ণাংগ সাহিত্য ভিন্ন যে পরিপূর্ণ চরিত্রের গঠন সম্ভব নয়, এই কথা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর "জাতীয় সাহিত্যে" প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। আমাদের বালকদের অল্পবয়স থেকে সেই পূর্ণাবয়ব সাহিত্যের সংগে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ভার বাংলার শিক্ষকের ওপর ন্যস্ত।

ব্যাকরণ ভাষার বিশুদ্ধতার ভিত্তি হ'লেও রচনায় তার আত্মপ্রকাশ সাহিত্যরীতিবিরোধী। ব্যাকরণের কাজ "অদ্রিতলে শিলার" মত ভাষার অন্তরালে থেকে ভাষাকে বিশুদ্ধ করে' সাহিত্যের উপযোগী করা। এখন প্রশ্ন এই যে সাহিত্যপাঠের মধ্যে বাধা ঘটাবেনা অথচ সাহিত্যবর্জিতভাবে পড়ান হবে না, তবে তা পড়ান হবে কখন?

এ সম্বন্ধে পূর্বপরিচ্ছেদে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। তবু আরো কয়েকটি কথার প্রয়োজন। পাঠ্যবিষয়রূপে ব্যাকরণের সংগে পরিচয় তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীতে কার্যিকভাবে ঘটার পর পঞ্চমশ্রেণী থেকে সাধারণত ব্যাকরণপাঠ করান হয়ে থাকে। সেই সময়ে পাঠ্যপুস্তক থেকে ব্যাকরণের বিষয়সমূহের উদাহরণ দেওয়া হবে। কিন্তু তা সাহিত্যের শ্রেণীতে নয়, রচনার জন্য নির্দিষ্ট পাঠে যে নানা প্রক্রিয়ার দ্বারা ভাষার ব্যবহারের অভ্যাস চলে, তার সংগে পাঠ্যপুস্তক থেকে উদ্ধৃত শব্দ-বাক্যাদির উদাহরণ সংযুক্ত করে' ব্যাকরণের সংগে অনুবন্ধ সাধিত হবে।

তারপর সপ্তম শ্রেণীতে ব্যাকরণের জ্ঞান এতটা অগ্রসর হয়েছে বলে' ধরা যায় সে ছাত্রদের পক্ষে বৈজ্ঞানিকভাবে তার আলোচনা চলতে পারে। ব্যাকরণ শিক্ষার পদ্ধতির আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। এই প্রসংগে কেবল এইটুকু বলা দরকার যে ব্যাকরণের পৃথক আলোচনার ফলে ব্যাকরণকে সাহিত্য থেকে আলাদা জিনিষ বলে' ছাত্রদের যেন ধারণা না হয়। বিদ্যালয়ে যেমন প্রত্যেক বিষয়ের পৃথক ঘণ্টা নির্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও সবগুলির অনুবন্ধসাধনই আদর্শরূপে গৃহীত হয়, ভাষা, সাহিত্য ও ব্যাকরণের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়েও সে কথা আরো বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যদিও ব্যাকরণের ক্লাশে ব্যাকরণ, রচনার ক্লাশে রচনা ও পাঠ্যপুস্তকের ক্লাশে পাঠ্যপুস্তক পড়ান হয়ে থাকে তবু শিক্ষককে এদের সংযোগসূত্রের প্রতি সর্বদা সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। ব্যাকরণ ও রচনার ঘণ্টায় ক্রমাগত পাঠ্যাংশ থেকে উদাহরণ দিয়ে দিয়ে সাহিত্যের সংগে এদের অংগাংগিসম্বন্ধ স্পষ্ট করে' দেখিয়ে দিতে হয়।

ছোটদের সাহিত্য

বাংলা পড়ানোয় সাহিত্যপাঠের কত প্রয়োজন ও তার সুযোগ কত কম সে আলোচনা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে হয়েছে। আধুনিকতম শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে নিচের শ্রেণীতে বাংলা শেখাবার জন্য কর্মবহুল 'পুস্তকহীন' শিক্ষার ব্যবস্থা দেওয়ার ফলে নিম্নতম স্তরে সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেড়ে গেছে। কেননা, শিশুরা কাজের মধ্যে ভাষার ব্যাবহারিক শিক্ষা যতই পাক না কেন, ছোট লাইব্রেরিতে, অবারিত সাহিত্যপাঠে তাদের সাহিত্যের আত্মিক মূল্য অর্জন করে' নিতে হবে।

বাংলার পাঠ্যপুস্তক আরম্ভ হবার কথা তৃতীয় শ্রেণী থেকে। এগুলির মধ্যে আজকাল সাহিত্যিক প্রয়াস দেখা গেলেও এই কাটাছাঁটা, আল-দেওয়া ডোবার জলে রসতৃষ্ণা মেটা তো দূরের কথা, সহজ ও ব্যাপক ব্যবহারশিক্ষারও যথেষ্ট সুযোগ নেই। পঞ্চম শ্রেণী থেকে দ্রুতপাঠপুস্তকের ব্যবহার প্রচলিত আছে, কিন্তু সে ব্যবস্থা সাহিত্যসাধনার পক্ষে সংকীর্ণ ও অপ্রতুল।

বিদ্যালয় যদি ছাত্রদের মনে প্রকৃত সাহিত্যবোধ জাগাতে না পারে তবে খেলো, উত্তেজনাময়, রোমাঞ্চকর উপন্যাসের প্রভাবে চরিত্রহানি ঘটা সম্ভবপর। দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের বিদ্যালয়গুলি এদিকে যথেষ্ট সচেতন নয় এবং বিদ্যালয়ের পাঠের ক্রম ও পদ্ধতিও সাহিত্যবোধগঠনের সহায়ক নয়। অপরপক্ষে আমাদের ছোটদের সাহিত্য এই প্রয়োজন সাধনোপযোগী পরিণতি লাভ করেছে কিনা সে কথাও জিজ্ঞাসা করা যেতে

পারে। সেই প্রশ্নেরই সংক্ষিপ্ত ও আংশিক আলোচনা এই পরিচ্ছেদে করা হবে।

পৃথিবীর সব দেশেই ছোটদের সাহিত্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের সৃষ্টি। বাংলাভাষায় এর বয়স একশো বছরের কিছু বেশি। এদেশে বৃটিশের রাজত্ব আরম্ভ হবার পর ইংরেজিতে ছোটদের সাহিত্য দেখে আমাদের দেশের মনীষীরা তার অনুকরণ করেন। তখনকার দিনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের "কথামালা" "বোধোদয়", "আখ্যানমঞ্জরী", অক্ষয়কুমার দত্তের "চারুপাঠ", মদনমোহন তর্কালংকারের "শিশুশিক্ষা", মনমোহন বসুর "পদ্যমালা", এইসব বই ছোটরা পড়ত। আরেকটু বড় বয়সের পাঠ্য ছিল "সীতার বনবাস", "শকুন্তলা", "কাদম্বরী", "রামের রাজ্যাভিষেক", "টেলিমেকস্", "পৌলবর্জিনী" ইত্যাদি। এগুলি আজকাল ছেলেপিলেদের মনোরঞ্জন করতে পারে না, কারণ এদের অধিকাংশই উপদেশমূলক, তার ওপর ভাষা অত্যন্ত কঠিন।

প্রকৃত শিশুসাহিত্য কাকে বলা যায় সেই প্রসংগে তার তিনটি লক্ষণের উল্লেখ করা হয় ঃ—

প্রথমত, এই সাহিত্য ছোটদের বোধোপযোগী সরল হবে। এইদিক থেকে শিশু, বালক ও কিশোরদের জন্য শিশুসাহিত্য, বালসাহিত্য ও কিশোর সাহিত্য এই তিনটি স্তরের দাবী করা হয়। ছেলেপিলেরা শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের মধ্যে দিয়ে যৌবনের দ্বারে উপনীত হয়, তাই শিক্ষা দেবার সময়ে যেমন ছাত্রের জীবনের বিভিন্ন স্তরের বিশেষ মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হয় তেমনি ছোটদের সাহিত্যেরও পাঠকের পরিণতি অনুযায়ী তিনটি স্তর থাকা দরকার।

দ্বিতীয়ত, ছোটদের সাহিত্য সরল হ'লেও খেলো হবে না। তাদের জীবনের প্রতিটি স্তরেই তারা নিজ বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য দ্বারা সমৃদ্ধ। তারা

অপরিণত মানব নয়, পূর্ণপরিণত শিশু, বালক ও কিশোর। তাই ছোটদের উৎকৃষ্ট সাহিত্যও তাদের মনের পূর্ণতা ও ভাববৈচিত্র্যকে স্বীকার করে' তার অনুগামী হবে।

তৃতীয়ত, ছোটদের সাহিত্য বৈচিত্র্যময় ও পূর্ণাবয়ব হবে। বড়দের জন্য সে সম্পূর্ণাংগ জাতীয় সাহিত্য কামনা করা হয় ছোটদের সাহিত্যেরও সেই পূর্ণতা কাম্য, তাই তাকে সমস্ত শাখাপ্রশাখায় পূর্ণাংগ হতে হবে।

সাহিত্যের প্রাথমিক দুই শাখা পদ্য ও গদ্য ঃ ছোটদের সাহিত্যকেও তদনুযায়ী ভাগ করে' প্রথমে পদ্যের ও পরে গদ্যের আলোচনা করব।

ছেলেভুলোনো ছড়া শিশুর প্রথম কাব্য। একবর্ণ, দ্বিবর্ণ, ত্রিবর্ণ চিত্রসমন্বিত বহু ছড়া ও কবিতার বই বেরিয়েছে ঃ খুব ছোটদের জন্য 'ঘুমতি নদীর ঢেউ' "স্বপনপুরী" প্রভৃতির থেকে আরম্ভ করে' নানারকমের শিশু ও বালকদের কবিতা যথেষ্ট রচিত হচ্ছে। ছোটদের জন্য যাঁরা এই ধরনের কবিতা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে সুনির্মল বসুই সর্বপ্রধান। কিন্তু এই সাহিত্যের একটি খুঁৎ রয়ে গেছে এই যে আমাদের দেশের পুরোনো ছেলেভুলোনো ছড়ার সংগ্রহ ও প্রকাশের দিকে তেমন দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের "খুকুমণির ছড়া" আর রবীন্দ্রনাথের "লোকসাহিত্যের" "ছেলেভুলোন ছড়া" নামক প্রবন্ধ ভিন্ন এগুলি ভালভাবে প্রকাশিত হয়েছে কিনা সন্দেহ; অথচ এগুলির মধ্যে শিশুমনের প্রকৃত রূপটি যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমন আর কিছুতে নয়।

ছোটদের অনেক প্রথম পাঠের বইয়ে এত সুন্দর সুন্দর ছবি ও ছড়া সন্নিবিষ্ট হয়েছে যে সেগুলিকে সাহিত্যের মধ্যেই ধরা যায়; বিশেষত আজকাল "পুস্তকহীন" শিক্ষাপদ্ধতি গৃহীত হওয়ায় এগুলি প্রধানত এদের সাহিত্যিক মূল্যের জন্যই আদৃত হবে। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের "হাসিখুসী" ও "হিজিবিজি" এবং সুখলতা রাওয়ের "পড়াশুনা" এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

অধুনা প্রকাশিত গোবিন্দগুপ্তের "কথাশেখা" ও "পড়াশেখা'য় পড়তে শেখানোর এক নূতন পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে। স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর "সহজপাঠের" ও গল্পে শিশুসাহিত্যের আসরে এসে বসেছেন।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর "ছোট্ট রামায়ণ" শিশুদের জন্য কবিতায় লেখা রামায়ণের গল্প। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভাতের জন্মকথায়" সুন্দর রঙিন ছবি ও সরল কবিতায় প্রথম বর্ষায় লাঙল কাঁধে চাষীর মাঠে যাওয়া থেকে আরম্ভ করে' নবান্ন পর্যন্ত চাষের কথাকে সরস করে' বলা হয়েছে। গিরীন্দ্রশেখর বসুর বড় বড় ছবিওয়ালা সুন্দর, চকচকে "লালকালো" বইয়ে গদ্যপদ্যে মিলিয়ে লালপিঁপড়ে আর কালোপিঁপড়েদের যুদ্ধের এক গল্প বলা হয়েছে। আজকাল ছোটদের আরো অনেক ছোটখাট "কাব্য" প্রকাশিত হচ্ছে কিন্তু তারমধ্যে সবগুলিই যে সাহিত্যোত্তীর্ণ হয়েছে তা বলা যায় না।

বালকদের উপযোগী হাসির কবিতার বই সুকুমার রায়চৌধুরীর "আবোলতাবোল" আজ পর্যন্ত স্বশ্রেণীতে অদ্বিতীয় হয়ে আছে। সুনির্মল বসুর কবিতায় অনেক সময়ে তাঁর সুরের রেশ পাওয়া যায়। লিউয়িস ক্যারলের "হান্টিং অব্ দি স্নার্ক" জাতীয় মজার লম্বা কবিতা বাংলায় বিশেষ নেই যদিও রবীন্দ্রনাথের "হিং টিং ছট" ও "জুতা আবিষ্কার"কে ওর স্বগোত্রীয় বলা যায়। আর লিমারিকের মধ্যে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের "খাপছাড়া" বাংলা সাহিত্যে একমাত্র।

শিশুপাঠ্য গ্রন্থ না হ'লেও "শিশু"তে অনেকগুলি এবং "শিশু ভোলানাথে" কয়েকটি ছোটদের উপযোগী কবিতা আছে। এর কোনকোনটিতে শিশুমনের রূপ অবিকৃতভাবে ধরা পড়েছে এবং কয়েকটির মধ্যে শিশুর ছেলেখেলার কথা এমন সস্নেহ কৌতুকের সংগে বর্ণিত হয়েছে যা বালকদের

উপযোগী। রবীন্দ্রনাথের "কথা ও কাহিনী"র কবিতা কিশোর ও বালকদের উপযোগী, তাছাড়া তাঁর অনেক উচ্চভাবপূর্ণ ও দেশাত্মবোধক কবিতা ও গান পড়ে' কিশোরবয়স্কেরা আনন্দ ও প্রেরণা পায়। বাংলার প্রাচীন ও আধুনিক অনেক কবির কবিতাসংগ্রহ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযুক্ত বলে' গণ্য হতে পারে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারতের সরল সংস্করণ ও মংগলকাব্যের অংশবিশেষ কিশোরদের পক্ষে অবশ্যপাঠ্য। মধুসূদনের "মেঘনাদবধ কাব্যে"র অনেকাংশ উচু ক্লাসে এবং "নীতিগর্ভ কবিতাবলী" মধ্যশ্রেণীতে পড়ান হয়; তাঁর "চতুর্দশপদী কবিতাবলী," "বীরাংগনাকাব্যে"র "দশরথের প্রতি কৈকেয়ী" ও গীতি-কবিতার দুয়েকটির উচ্চশ্রেণীতে ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়। তাঁর চতুর্দশ-পদী কবিতার আরো অনেক বেশি আলোচনা হওয়া উচিত। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রংগলাল প্রভৃতি কাব্যকারের কবিতার অংশবিশেষ বহুদিন থেকে কিশোরবয়স্কদের পঠনের জন্য ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ বাগচি, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, নজরুল, জসীম-উদ্দীন প্রভৃতির অনেক কবিতাকে কিশোর-সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখ করা যায়। মহিলা কবিদের মধ্যে মানকুমারী বসু, কামিনী রায় প্রভৃতির কবিতা মিষ্ট এবং উচ্চাদর্শে পূর্ণ।

দুঃখের বিষয় ছোটদের উপযোগী ভাল কবিতাসংগ্রহ বেশি নেই। ছোটদের কবিতার বই "খেলার গান ও কবিতা"র মত বই আজকাল পাওয়া যায় না এবং বালকদের উপযোগী "ছোটদের চয়নিকা"র নূতন সংস্করণ আর প্রকাশিত হয়নি। কিশোরবয়স্কদের জন্য "আবৃত্তিমঞ্জুষা" সুযোগ্য ও সুন্দর হয়েছে কিন্তু সাহিত্যের ধারানুযায়ী মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কাব্যের সংগ্রহের নিতান্তই প্রয়োজন।

সাহিত্যের দ্বিতীয় শাখা গদ্য পদ্য অপেক্ষা বহুপঠিত। তাছাড়া জ্ঞান-

বিজ্ঞানের বাহন হিসেবে আধুনিকযুগে গদ্যের আদর বেশি। সাধারণ গদ্যসাহিত্যের যেমন শ্রেণিবিভাগ করা হয়ে থাকে ছোটদের গদ্যেও সেরূপ করা হয়।

বড়দের মধ্যে যেমন গল্প ও উপন্যাসের জনপ্রিয়তা সর্বাপেক্ষা বেশি তেমনি ছোটদের সাহিত্যেও ছোট ও বড় গল্পের সংখ্যা বেশি। এর মধ্যে বয়সোপযোগী স্তর ও সাহিত্যানুযায়ী শ্রেণিভেদ দেখা যায়। খুব ছোটদের জন্য যুক্তাক্ষরবর্জিত, সুন্দর ছবি ও ছাপা অথচ সুলভ, ছোটদের রামায়ণ, আলিবাবা, ঈসপ, গালিভার প্রভৃতির গল্পের বই প্রকাশিত হয়েছে। তার চেয়ে অল্প একটু বড়দের জন্য চিত্রবহুল "ফটকে", "কৃপণের পরিণাম" প্রভৃতির নাম করা যায়। কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত এত সুলভে এমন বই পাওয়া বাংলার শিশুর পক্ষে অভাবনীয় ছিল কিন্তু সেই অনুসারে এদের রচনায় যত্ন না নেওয়ায় বইগুলিকে নিখুঁত বলে' প্রশংসা করা যায় না।

পরীকাহিনীর মধ্যে সুখলতা রাওয়ের "গল্পের বই" আর "আরো গল্প" অনেক দিন আগে বিখ্যাত হয়েছিল। সম্প্রতি তাঁর "গল্প আর গল্প" কেন্দ্রীয় সরকারের শিশুসাহিত্যের পুরস্কার পেয়েছে। সুখলতা রাও ভিন্ন আরো অনেকেই সুন্দর সুন্দর পরীকাহিনী লিখেছেন কিন্তু ছেলে ভুলোনো ছড়ার মধ্যে পুরোনো বাংলা ছড়ার মতো পরীকাহিনীর মধ্যে প্রাচীন রূপ-কথাগুলি যথেষ্ট আদৃত হয়নি। দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের "ঠাকুরমার ঝুলি" প্রভৃতির মতো প্রাচীনগন্ধী বই আজকাল দেখতে পাওয়া যায় না বল্লেই হয়। ওগুলির লিখনভংগী এবং সবগুলি ভাব হয়তো আধুনিক রুচিসম্মত নয়, কিন্তু ওরা ছেলেভুলোনো ছড়ার মতোই এমন এক আদিম অকৃত্রিমতায় মণ্ডিত ছিল যার জন্য শিশুমনের কাছে অত্যন্ত সহজভাবে চিত্তাকর্ষক হ'ত। বাংলায় পল্লীকাহিনীর সংগ্রহের পুনঃপ্রচলন এই কারেণই বাঞ্ছনীয়। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর "টুনটুনীর বই" এমনি একটি

সংগ্রহ এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ক্ষীরের পুতুল" পুরোনো ধাঁচে রচিত মৌলিক গল্প।

এছাড়া অবনীন্দ্রনাথের "আলোর ফুল্‌কি", বিভূতিভূষণ গুপ্তের "বেড়াল ঠাকুরঝি" (পুরোনো ধাঁচের), জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর "টাকডুমাডুম", সীতাদেবী ও শান্তা দেবীর "নিরেট গুরুর কাহিনী", শৈলেন্দ্রনাথ-সিংহের "পুতুলপুরী", স্থনির্মল বসুর "ইন্টিবিন্টির আসর," শশিভূষণ দাশ-গুপ্তের বাস্তবিক চমৎকার "ছুটির দিনে মেঘের গল্প" প্রভৃতির নাম করা যায়। বস্তুত ছোটদের গল্পের বইয়ের আর শেষ নেই বললেই হয় এর মধ্যে উৎকৃষ্টগুলিকে শিক্ষক সমাজের সাবধানে বেছে নিতে হবে। দুঃখের বিষয় যোগীন্দ্রনাথ সরকারের অত স্থন্দর শিশুসাহিত্য ছবি-ছাপা-বাঁধাইয়ের অনুৎকর্ষের জন্য নষ্ট হ'তে চলেছে।

ইংরেজী ও য়ুরোপীয় সাহিত্যের এবং এসিয়ার নানা দেশের অনেক রূপকথা ও পরীকাহিনী বাংলায় লেখা হয়েছে। এর মধ্যে গ্রীম ও হান্স এণ্ডার্সনের পরীকাহিনী, গ্রীক ও রোমের পুরাণ কাহিনী, ঈসপের কাহিনী প্রভৃতি প্রধান। বিদেশী গল্পের যেগুলি ভাল বই তার মধ্যে অমিয়কুমার চক্রবর্ত্তীর "পাতালপুরীর ছোট্ট মেয়ে", "অথই জলের রূপকথা", খগেন্দ্রনাথ মিত্রের "চীনের রূপকথা", "পাথরের ফুল", অরুণকুমার ঘোষের "রাশিয়া থেকে" প্রভৃতির নাম করা যায়। অন্যদিকে আলাদিনের প্রদীপ, সিন্দবাদ নাবিক প্রভৃতি গল্পের বিভিন্ন বাংলা সংস্করণ ছেলেপিলেদের মনোরঞ্জন করছে। একটু বড়দের জন্য কয়েকখণ্ডে সম্পূর্ণ "দেশবিদেশের লেখা" বিশ্ব-সাহিত্যের ভাণ্ডারস্বরূপ। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের গল্পের মধ্যে "সাঁওতালী উপকথা", "হো-দের গল্প" "হিন্দুস্থানী উপকথা" প্রভৃতি নানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের দেশের হিতোপদেশ, জাতক, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত

ইত্যাদির কাহিনীর বহু বালপাঠ্য সংস্করণ আছে। উপেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরীর "ছেলেদের রামায়ণ", "ছেলেদের মহাভারত", "মহাভারতের গল্প", কুলদারঞ্জন রায়ের "পুরাণের গল্প", "বত্রিশ সিংহাসন", "বেতালপঞ্চবিংশতি", নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের "টুকটুকে রামায়ণ", রাজশেখর বসুর "হিতোপদেশের গল্প" তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পঞ্চপ্রদীপ" প্রভৃতি অনেক বইয়ের নাম করা যায়। সংস্কৃত সাহিত্য অবলম্বনে রচিত বইয়ের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের "সীতার বনবাস", অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "শকুন্তলা", যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "সংস্কৃত নাটকের গল্প" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শিশুসাহিত্যের আর-একটি শাখা আছে যাকে কল্পনাপ্রধান বলে' অভিহিত করা যায়। এর কতকগুলির মধ্যে কল্পনার সহায়তায় হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলিতে শিশুমনের ভাববৈচিত্র্য পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথের "সে" এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, বিশ্বসাহিত্যে এর তুলনা পাওয়া দুষ্কর। ছোট শিশু এর সূক্ষ্মরস সম্পূর্ণ বুঝতে পারে না, এই বই পুরোপুরি উপভোগ করতে পারে কিশোরবয়স্কেরা। সুকুমার রায়চৌধুরীর "হ-য-ব-রল" আর লীলা মজুমদারের "বদ্যিনাথের বড়ি" ও "পদীপিসির বর্মীবাক্স" এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এতে খাপছাড়া ঘটনা আর মজার কথা সাজিয়ে ছবি ও গল্পের মধ্যে দিয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য "পদী-পিসীর বর্মীবাক্সে" উপন্যাসেরও গন্ধ পাওয়া যায়। আর বিশুদ্ধ কল্পনার দিকে ইংরেজী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কাহিনী "পিটারপ্যানে"র ভাব অবলম্বনে রচিত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "খাজাঞ্চির খাতা" লেখকের অপূর্ব কল্পনা-সম্ভারে শিশুর চিত্ত আকর্ষণ করে। প্রিয়ম্বদা দেবীর "পঞ্চুলাল" (Pinoccio) এবং সীতা ও শান্তা দেবীর "আজব দেশ" (Wizard of Oz) ও "হুক্কাহুয়া" (Uncle Remus এর গল্প) অফুরন্ত আনন্দের উৎসস্বরূপ। একটু বড়দের জন্য ধন-গোপালের "চিত্রগ্রীব" ও মেটারলিংকের "নীল-পাখী"র অনুবাদ হয়েছে।

বালক ও কিশোরদের উপযোগী গল্প ও উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট প্রচুর নেই। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের "গল্পসঞ্চয়" পুরোনো বই আর সুকুমার রায়চৌধুরীর ইস্কুলের হাসির গল্পের সংগ্রহ "পাগলা দাশু" সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের পুরস্কার পেয়েছে। শিবরাম চক্রবর্তীর হাসির গল্পের সংগ্রহ ও অন্যান্য মজার গল্পের বই ছোটদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্যকুমারেরও গল্প সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। সৌরীন্দ্রমোহনের "চালিয়াৎ চন্দর", যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "খেলার মাঠে" প্রভৃতি গল্পের বই প্রত্যেক বালকের বাস্তবজীবনের মধ্যে কল্পনার খোরাক জোগায়। কিন্তু, ছেলেদের উপন্যাসজাতীয় বই কিছু কিছু থাকলেও আগেকার দিনের "অনাথ" বা "উত্তরাধিকারী"র মতো সুন্দর গার্হস্থ্য উপন্যাস আর দেখতে পাই না।

কিশোরবয়স্কেরা বালকদের উপযোগী উপন্যাসগুলি পড়তে পারে আবার বড়দের অনেক উপন্যাসও তাদের পাঠ্য। সীতাদেবী ও শান্তাদেবীর "উদ্যানলতা", "সোনার খাঁচা," উপেন্দ্রনাথ গংগোপাধ্যায়ের কতকগুলি উপন্যাস প্রভৃতি তাদের উপযোগী বলে গণ্য করা হয়।

তাছাড়া বড়দের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মধ্যে কতকগুলির ছোটদের সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বংকিমচন্দ্রের অনেক উপন্যাসের ছোটদের সংস্করণ হয়েছে, বিভূতিভূষণের "আম আঁটির ভেপু" তাঁর 'পথের পাঁচালীর" বালসংস্করণ।

ইংরেজী থেকে "বিদ্যালয়ে বাদল" (Tom Browne's School Days) প্রভৃতি স্কুলপাঠ্য উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ হয়েছে এবং টলষ্টয়, স্কট, ডিকেন্স, ভিক্টর হ্যুগো প্রভৃতি ঔপন্যাসিকের বইয়ের বাংলা বালপাঠ্য সংস্করণ বেরিয়েছে।

ওপরে উল্লিখিত বইগুলি বাংলা বাল ও কিশোরপাঠ্য কথাসাহিত্যের

একাংশমাত্র; 'এডভেঞ্চার' জাতীয় উপন্যাস এর অপর ও বৃহত্তম শাখা। সাহস ও বীরত্বের আকাংক্ষা এই বয়সের বয়োগুণ বলে' এই সাহিত্যের এত বেশি প্রচলন। এর মধ্যে বিলেতি রোমাঞ্চকর কাহিনীর অনুবাদ ও অনুকরণ এবং মৌলিক রচনা দুই-ই দেখতে পাওয়া যায়।

অনুবাদ ও অনুকরণের মধ্যে "রত্নদ্বীপ", "আশ্চর্যদ্বীপ", "অজ্ঞাত-জগৎ", "বেলুনে চুয়াত্তর দিন", "সমুদ্রের তলায় বিশ হাজার লীগ" "রবিন্সন ক্রুসো", "রবিন হুড", "সুইস ফ্যামিলি রবিন্সন" শার্লক হোমসের ও টার্জানের গল্প প্রভৃতির নাম করা যায়। এগুলির সমালোচনাক্রমে এই কথা বলা চলে যে এইসব প্রসিদ্ধ কাহিনীর অনুবাদ করাই ভাল, এগুলির অনুকরণে বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালীজীবনের বই তৈরি করার প্রয়াস ভাল নয়। কেননা এইরূপ অনুকরণে সাহিত্যিক মূল্য ও গল্পের মাধ্যমে দেশবিদেশের সংগে পরিচয়ের সুযোগ দুইই কমে যায়।

মৌলিক রচনার মধ্যে আবার দুই রকমের সৃষ্টি দেখা যায়; এক, যে-সব ঘটনা সত্য-সত্যিই ঘটতে পারে, যেমন যোগীন সরকারের "বনেজংগলে", খগেন মিত্রের "ঝিলে জংগলে" হেমেন্দ্রকুমারের "যকের ধন", অচিন্ত্যকুমারের "ঘোর প্যাঁচ", নীহার গুপ্তের ডিটেকটিভ উপন্যাস, দস্যু মোহনের গল্প প্রভৃতি। অপর, কাল্পনিক ঘটনা নিয়ে রচিত বই, যেমন বিভূতিভূষণের "চাঁদের পাহাড়", হেমেন্দ্রকুমারের "ময়নামতীর মায়াকানন", "মংগলগ্রহের কাহিনী" এবং নানারকমের ভূতের গল্প, মোটামুটিভাবে এই শ্রেণীর বইগুলির সম্বন্ধে অভিমত এই যে পাঠকের মনে সাহসিকতার পিপাসা জাগিয়ে দিয়ে এগুলি উপকার করে; কিন্তু তলিয়ে দেখলে এগুলিকে নিছক মংগলপ্রদ মনে করা দুষ্কর। কল্পনা-

বিলাসী বাঙালীর পক্ষে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে চন্দ্রলোকের ভ্রমণকাহিনী কল্পনা করা সহজ বলে' এরূপ কল্পনার আতিশয্য অনিষ্টকর। যদি বাংলার বালক ও কিশোরদের জন্য বাস্তবের ভিত্তির ওপর স্থাপিত উপন্যাস যথেষ্ট থাকত তবে তার প্রান্তে রোমাঞ্চকর কাহিনীগুলি যথেষ্ট উপকার করতে পারত; কিন্তু যখন ছোটদের সাহিত্যের অধিকাংশ এই উগ্র উত্তেজনাময় রূপ ধারণ করে তখন সত্যকার ভাবনার কথা হয়। উপরন্তু কতকগুলি উৎকৃষ্ট রোমাঞ্চ-উপন্যাস লেখা হওয়া সত্ত্বেও এই শ্রেণীর অধিকাংশই সেই রকমের, যে রকম সস্তা, খেলো বইকে ইংরেজীতে "পেনি-ড্রেডফুল" বলা হয়ে থাকে। সাহিত্যের দিক দিয়ে এগুলি যে বাস্তবিকই ড্রেডফুল তাতে সন্দেহ নেই। সম্প্রতি এরই আরো তরল ও নিকৃষ্ট সংস্করণ, বিলিতী আমদানি "হরর-কমিক" নিষিদ্ধ করায় শিক্ষা ও সাহিত্যের উপকার হয়েছে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে বালক ও কিশোরের রোমাঞ্চের আকাংক্ষা চরিতার্থতা লাভ করে। এর মধ্যে তুটো শ্রেণী দেখা যায়। প্রথম, সত্যকারের ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে, যেমন "রাজকাহিনী" "রাজাবাদশা", "রণডংকা" ইত্যাদি। দ্বিতীয়, কোন বিশেষ ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে রচিত উপন্যাস, যেমন "তান্তিয়ার বাহাদুরী", "বিশে ডাকাত", "রঘু ডাকাত", "বাঁশের কেল্লা" প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস "রাজর্ষি" কিশোরদের উপযোগী। তাছাড়া বংকিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির এবং প্রথম বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস "বংগাধিপ পরাজয়ের" ছোটদের সংস্করণ বেরিয়েছে। বিলেতী ঐতিহাসিক উপন্যাসেরও বাংলা অনুবাদ হয়েছে। ছেলেদের মনে ইতিহাসচেতনা জাগাবার জন্য এগুলি মূল্যবান।

ছোটদের নাটকের মধ্যে সুকুমার রায় চৌধুরীর "লক্ষ্মণের শক্তিশেল"

আর "ঝালাপালা" উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের "মুকুট" ছেলেদের আর "লক্ষীর পরীক্ষা" মেয়েদের অভিনয়যোগ্য ভাল বই। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পুরুষবর্জিত নাটক "ধূপের ধোঁয়ায়" মেয়েরা আর রবীন্দ্রনাথের "অচলায়তন" ছেলেরা অভিনয় করতে পারে। রবীন্দ্রনাথের "হাস্য-কৌতুকের" নাটিকা কিশোররা অভিনয় করতে পারে। অনেক ছোট ছোট হাস্যরসবহুল নাটিকা আজকাল প্রকাশিত ও অভিনীত হচ্ছে কিন্তু সবগুলির সাহিত্যিক উৎকর্ষ যথেষ্ট নেই। "আবৃত্তি-গান-কবিতা" নামক বইয়ে শিশু থেকে আরম্ভ করে' কিশোরদের পর্যন্ত অভিনয়ের উপযোগী ছোট ছোট পালা আছে।

গল্প ও উপন্যাস ছাড়া গদ্য সাহিত্যের অপর এক বৃহৎ শাখা আছে। যার সাহায্যে ছেলেরা দেশবিদেশের জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহিত্যেতিহাসের বিচিত্র তথ্যসম্ভারের সংগে পরিচিত হয়।

অন্য পরিচ্ছেদে বাংলা সাহিত্যের সরস ইতিহাসের অভাবের কথা বলা হয়েছে। প্রিয়রঞ্জন সেনের "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস", যোগেন গুপ্তের "বাংলার মহিলা কবি" প্রভৃতি দু'একটি বই ভিন্ন এই বিষয়ে আর কিছু লেখা হয়নি বললেই হয়। বিশ্বসাহিত্যপরিচয়ের দিক দিয়ে "সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ", "পৃথিবীর সেরা সাহিত্য", "সাহিত্যের গল্প" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ভারতের ইতিহাস এখনও সুন্দর গল্পাকারে রচিত হয়নি, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসের কথা বলবার চেষ্টা হয়েছে। এই বিষয়ে "জ্ঞানবিজ্ঞান", "পৃথিবীর ইতিহাস", "সেকালের কথা", "অতীতের পৃথিবী" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বই।

জীবনিশাখায় ভারতের ও পৃথিবীর ঐতিহাসিক ও আধুনিক বড় বড় লোকদের জীবনী নিয়ে ছোটবড় অনেক বই রচিত হচ্ছে। স্বয়ং

রবীন্দ্রনাথ (ছোটবেলা), অবনীন্দ্রনাথ (আপনকথা) ও শরৎচন্দ্র (ছেলেবেলার গল্প) নিজেদের জীবনের কিছু কিছু কিশোরদের উপহার দিয়েছেন।

বাংলায় ছোটদের উপযোগী ভ্রমণকাহিনী যথেষ্ট না থাকলেও সাধারণ সাহিত্যের অন্তর্গত এই শ্রেণীর অনেক বই ছোটরা পড়ে' বুঝতে পারে। দেশবিদেশের শিশু, বালকবালিকা ও কিশোরকিশোরীর পরিচিতি এখনও অপেক্ষমান। এ-দিকে আজ পর্যন্ত যা হয়েছে তা সর্বত্রগামী হয়নি এবং কোনো কোনো বই একদেশদর্শী ও প্রচারদুষ্ট হয়েছে।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলাসাহিত্যে ছোটদের জ্ঞানবিজ্ঞানের বইয়ের অভাব অনেকাংশে ঘুচেছে। "পোকামাকড়", "গাছপালা", "জীবজন্তু", গ্রহনক্ষত্র" প্রভৃতি বহুদিনপ্রচলিত গ্রন্থ ছাড়া "জীবজগতের আজব কথা", 'জানোয়ার", আজব বই" "জ্ঞানবিজ্ঞান", "জ্ঞানবিজ্ঞানের কি ও কেন ?", "কেনর উত্তর", "বলতো ?", "পাতালপুরীর দিগ্বিজয়ী", "ক্ষুদে শয়তানের রাজত্ব", "এরোপ্লেনের গল্প'', বেতারের গল্প'' প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর বই রচিত হয়েছে। অপরপক্ষে কয়েকটি জ্ঞানবিজ্ঞানের বইয়ের প্রচারদুষ্টতা তাদের ছোটদের অনুপযোগী করে' তুলেছে।

জ্ঞানবিজ্ঞানসংকলনের দিকে রবীন্দ্রনাথ "বিশ্বপরিচয়" ও "ছুটির পড়া'' লিখেছেন এবং বিশ্বভারতীর লোকসাহিত্য গ্রন্থমালায় অনেক দরকারি বই সন্নিবিষ্ট হয়েছে। "জিজ্ঞাসা'' এই ধরণের একটি সিরিজ সবে আরম্ভ করেছে। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সংকলিত "শিশুভারতী" সর্বাংগসুন্দর না হ'লেও পরিকল্পনাটি ভাল। আয়োজন অনেক হয়েছে বটে, কিন্তু একটি দিক এখনও বাকি আছে, এখনও অতিপরিচিত পরিবেশের অবলম্বনে আমাদের প্রাত্যহিক অন্ন-বস্ত্র-গৃহ, পথ, আলো, ডাক, প্রভৃতির সম্বন্ধে বই লেখা হয়নি।

মাসিক বা বার্ষিক সাময়িক পত্রিকা ছোটদের সাহিত্যের অপরিহার্য অংগ। সাময়িক পত্রিকায় গল্প, কবিতা, উপন্যাস, ইতিহাস, ভ্রমণ, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ক আলোচনা ভিন্ন যে নানা তৎকালীন সংবাদ থাকে সেগুলি বালক ও কিশোরদের উপযোগী ও আনন্দদায়ক। এ ছাড়া ধাঁধা, প্রতিযোগিতা প্রভৃতির দ্বারা তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈপুণ্য বৃদ্ধি পায়। বাংলার প্রথম ছোটদের মাসিক ছিল প্রমদাচরণ সেনের "সখা" আর ভুবনমোহন রায়ের "সাথী", যা পরে "সখা ও সাথী" রূপ ধারণ করেছিল। তারপর বেরোয় "মুকুল"। ছেলেদের প্রথম বাস্তবিক উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র ছিল উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর "সন্দেশ"। আজকালকার ছোটদের কাগজ হচ্ছে—"মৌচাক", শিশুসাথী", "রামধনু" 'শুকতারা" ইত্যাদি। তাছাড়া প্রায় প্রত্যেক বড়দের পত্রিকায় ছেলেদের জন্য অংশ নির্দিষ্ট থাকে। মাসিক পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যাও প্রকাশিত হয়। আধুনিক বাংলা ছোটদের পত্রিকাগুলির দুর্বলতা এই যে এদের অনেকগুলি এখন পর্যন্ত উপযুক্ত সাহিত্যিক মান স্থাপিত করতে পারেনি, অথচ, অনর্থক রাজনৈতিক প্রচারের প্রলোভনে জড়িয়ে শিক্ষানীতিকেও অগ্রাহ্য করে' চলেছে।

ছেলেদের সাময়িক সাহিত্যের বিশেষ অংগ সংবাদপত্র; কিন্তু আমাদের দেশে একটিও ছোটদের সংবাদপত্র নেই। বালক ও কিশোরেরা সংবাদপত্রের মারফত বিশ্বজগতের প্রাত্যহিক ঘটনাবলীর পরিচয় লাভ করতে পারে, অথচ বড়দের পত্রিকাগুলির রাজনৈতিক দলাদলির আবহাওয়া তাদের অনুপযোগী। তাছাড়া বড়দের পত্রে বয়স্কদের জ্ঞানের ও মনের পরিপক্কতার অনুযায়ী ভাবে বিষয়গুলির আলোচনা হয়। ছোটদের সামনে সে-সবের সরল ব্যাখ্যা না দিলে তাদের পক্ষে বোঝা কঠিন এবং বুঝলেও তাদের অকালপক্ক হওয়ার সম্ভাবনা।

ছোটদের একটি খবরের কাগজের অভাব যতদিন না পূর্ণ হচ্ছে ততদিন বড়দের পত্রের অংশবিশেষ তাদের সামনে উপস্থিত করা ভিন্ন উপায় নেই। কোন কোন বিদ্যালয়ে পত্রিকার নির্বাচিত কর্তিত অংশ টাঙাবার জন্য বোর্ড নির্দিষ্ট করা থাকে এবং ছাত্রদের অনুরূপ অংশ সংগ্রহ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়।

বিদ্যালয়ের মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকার মত ছাত্রপরিচালিত দৈনিক পত্রিকাও করা যায়। শ্রেণীর "খবর-বলা" ও "দেয়ালপত্রের" ধারা বেয়ে এরূপ পত্রিকার বিবর্তন কঠিন হবেনা।

পাঠক্রম

শিক্ষাবিধির নিয়মানুযায়ী পাঠনের ক্রমনির্দেশ করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক ঘণ্টার পাঠ্যবিষয়কে সেই অনুসারে সজ্জিত করে' স্তরে স্তরে তার আলোচনা হয়। এই ক্রম অনেকাংশে কৃত্রিম এবং নোতুন শিক্ষাপদ্ধতি-সমূহের উদ্ভাবনে অনেকাংশে কালবারিত হ'লেও এখন পর্যন্ত শিক্ষণশিক্ষায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

জানা থেকে অজানায়, সরল থেকে কঠিনে, নিকট থেকে দূরে, বিশিষ্ট থেকে সাধারণ, বস্তু থেকে ভাবে যাওয়ার নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক পাঠ পূর্বজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এইজন্য ভূমিকা বা উপক্রমণিকা পাঠক্রমের প্রথম অংশ। উপস্থিতপাঠ্য যদি পূর্বপাঠের অনুবৃত্তি হয়ে থাকে তবে ভূমিকারূপে পূর্বপাঠের পুনরালোচনা চাই। যদি পূর্বাধীত বা পূর্বপরিচিত বিষয়ের অনুরূপ বিষয় প্রস্তুত হয়ে থাকে তবে পূর্ববিষয়ের তুলনা চাই। সম্পূর্ণ নূতন বিষয় হ'লে পরিচিত কোন বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞানের ভিত্তির ওপর তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যেমন নায়েগ্রা জলপ্রপাত পাঠ্যবিষয় হ'লে ভারতীয় কোন জলপ্রপাতের সংগে তুলনা করে' ভূমিকা করা যায়; দার্জিলিংএর বিষয়ে প্রবন্ধ পড়াতে হ'লে ছাত্রের অভিজ্ঞতার অন্তর্গত কোন পাহাড়ে দেশের সংগে তুলনা করা যায়। জিনিস, মডেল বা ছবি দেখিয়ে, কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বা গল্প বলে' ভূমিকা করা যায়। যেমন শ্রেণীর কোনো ছেলে যদি পাহাড় না দেখে থাকে তবে ছবি দেখান ছাড়া ভূমিকার উপায় নেই; ফুলের সম্বন্ধে পড়াতে ফুল দেখালে সুন্দর ভূমিকা হয়, দানশীলতা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পড়াবার আগে দানশীল ব্যক্তির গল্প বললে ভাব-

বিষয় বাস্তবজ্ঞানের ভিত্তিতে স্থাপিত হয় ঃ ঋতুসম্বন্ধীয় প্রবন্ধরচনার ভূমিকা ঋতুসম্বন্ধীয় কবিতা পাঠের দ্বারা করা যায় ; ইত্যাদি।

তবে শিক্ষককে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে ভূমিকা যেন একটি নিষ্প্রাণ প্রক্রিয়ায় পরিণত না হয়। যেমন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "মেথর" পড়াবার সময়ে মেথর যে সব পরিষ্কার করে সে-কথার ভূমিকাস্বরূপ মায়ের সংগে তার তুলনা অসার্থক, কেননা, মেথর সব বাঙালীর কাছে সুপরিচিত। ভূমিকা মানে প্রস্তাবনা বা পাঠ্যবিষয়ের উত্থাপন। বিষয় অপরিচিত হ'লে কোন পরিচিত বস্তু বা কাহিনীর উত্থাপন করে' তাকে ছাত্রের কাছে সহজবোধ্য করে' দিতে হবে, নতুবা অনাবশ্যকরূপে বাইরে কথা না এনে সোজাসুজি বিষয়বস্তুতে উপনীত হওয়াই প্রকৃষ্ট পন্থা। যেমন, রবীন্দ্রনাথের "বীরপুরুষ" পড়াবার সময়ে কোন কাল্পনিক শিশুর কল্পনাপ্রবণতার কাহিনী দিয়ে ভূমিকা না করে' শিশুর মধ্যে গোপনে যে বীরপুরুষটি তার অদম্য আকাংক্ষাসমূহ নিয়ে বাস করে তার কথা মনে করিয়ে দিলেই সে পরম উৎসাহিত হবে ; কিংবা এরোপ্লেনের বিষয়ে পড়াবার সময়ে আধুনিক সহুরে শিশুর কাছে পুষ্পকরথের উপমা দেওয়ার সার্থকতা নেই, বরংচ পুষ্পকরথের বিষয় পড়াতে গেলে এরোপ্লেনের উপমা দেওয়ার দরকার হ'তে পারে। ওপরের শ্রেণীতে ভূমিকার সময়ে কবির জীবন ও রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়ে থাকে ; নিচের শ্রেণীর শিশুর কাছে সাহিত্যসম্বন্ধীয় সাধারণজ্ঞান আশা করা হয় না বলে' এই পরিচয়প্রদানের রীতি নেই। কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানের পক্ষ থেকে বিচার করলে, ওপরের শ্রেণীতেও কবি-পরিচিতি পাঠপ্রদানের পরে হওয়া উচিত। ভূমিকায় রচনাটি পড়ার আগে যেটুকু পরিচিতি হবে তা ছাত্রের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত নয়, শিক্ষকের প্রদত্ত, অপরপক্ষে পাঠের পরে পরিচিতিতে পাঠজনিত অনুভূতি ও প্রত্যক্ষের ব্যবহারে ছাত্র ও শিক্ষকের মিলিত আলোচনা সার্থক হয় ; স্বাধীন বিচার-

বুদ্ধির উদ্বোধন ও প্রয়োগ হয়। পূর্বপরিচিত লেখকের রচনাক্ষেত্রেও ভূমিকাস্থলে উল্লেখমাত্র করে' পুনরালোচনায় পূর্ব ও প্রস্তুতবিষয়ের সমাহার-মূলক আলোচনা করা ভাল।

ভূমিকার পর উপস্থাপন, পাঠপ্রদান বা মূল পাঠ্যবিষয়ের আলোচনা। কবিতা বা সরস গদ্য পাঠ্য হ'লে উপস্থাপনের প্রথমে শিক্ষক আদর্শপাঠ প্রদান করবেন, যাতে ধ্বনির মধ্য দিয়ে বিষয়ের অন্তর্নিহিত ভাব ছাত্রের মর্মস্পর্শ করে। সাধারণ গদ্যের পাঠে অনুচ্ছেদবিভাগানুযায়ী একেকটি অংশ পড়িয়ে পড়ান যেতে পারে।

পাঠপ্রদানের সময়ে শব্দার্থ, ব্যাখ্যা, ব্যাকরণাদির আলোচনার সংগে ভাবের আদানপ্রদান চলে। ব্যাখ্যার স্থবিধার জন্য বিয়য়টিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে' নেওয়ার পদ্ধতি আছে। কিন্তু এই পদ্ধতি গদ্যের উপযোগী হ'লেও পদ্যের ক্ষেত্রে সাহিত্যানুভবের পরিপন্থী। যুক্তিপ্রধান গদ্যের গতি স্বভাবতই ধাপে ধাপে; কিন্তু ভাবময় কবিতার পাঠের সময়ে সমগ্রদৃষ্টির প্রয়োজন। এই কারণে গদ্যের আংশিক আলোচনা হ'লেও পদ্যের হয়না। কবিতা পড়াবার সময়ে শিক্ষক প্রথমে সমগ্র কবিতার আদর্শ পাঠের পর কতকগুলি প্রশ্নের দ্বারা সামগ্রিক অনুভূতির যাচাই করে' নেবেন,তারপর স্তবকভাগ করে' ছাত্রদের দ্বারা পাঠ ও বিশ্লেষণ। উদাহরণ-স্বরূপ, "বৈরাগ্য" কবিতার আদর্শপাঠের পর শিক্ষক জিজ্ঞাসা করতে পারেন—"কবিতার প্রধান চরিত্র কে?"—"সে কি কাজে উদ্যত?"—"কি উদ্দেশ্যে সে ওই কাজ করতে চায়?"—"তার গৃহীত পথের বাধা কি?" ইত্যাদি এই ধরনের পাঁচ ছয়টি প্রশ্নের পর তিনি একেকটি অংশ নিয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হবেন। কবিতা দীর্ঘ হ'লেও খণ্ডিত আলোচনা ভাল নয়। বড় কবিতা পড়াবার সময়ে একদিন কেবল পাঠ ও অনুভবের পর কয়েকদিনের পাঠে একেক অংশ নিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়। অবশ্য

কবিতা যদি এত দীর্ঘ হয় যে একটি ঘণ্টায় সরব পাঠও শেষ করা যায় না, তবে তাকে বিভক্ত করতেই হবে। সেরূপ ক্ষেত্রে কবিতাটি পড়ান শেষ হয়ে গেলে সমস্তটির একসংগে অনুভবমূলক আলোচনা করান চাই।

ব্যাখ্যা অংশে শব্দার্থ বা ব্যাকরণের অতিরিক্ত আলোচনা যেন না হয়। বস্তুত উপস্থাপনে সে সব প্রসংগ যতদূর সম্ভব বর্জন করে' অনুভবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। নিতান্ত প্রয়োজনে শব্দার্থের আলোচনা হবে, ব্যাকরণ পুনরালোচনার আগে নয়, বরংচ সেই পাঠের মধ্যে একেবারেই না করে' পরবর্তী রচনা বা ব্যাকরণের পাঠের সময়ে ওই বিষয় থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

ব্যাখ্যার সময়ে শিক্ষককে ছাত্রদের খাটিয়ে নেবার জন্য তৎপর থাকতে হবে। ছাত্র যদি ভূমিকায় পাঠ্যবিষয়ের মোটামুটি সংকেত পায় তবে ব্যাখ্যার মূল অংশের অনেকখানিই তার কাছ থেকে আদায় করে' নেওয়া সম্ভব হবে। বিষয়বস্তু যদি কোন পরিচিত পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়ে থাকে তবে ছাত্র তার পূর্বজ্ঞান থেকে অনেকটা বুঝে নিতে পারবে; গল্প বা কবিতা পাঠ্যবস্তু হ'লে তাকে স্বীয় ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্যানুভূতির সাহায্যে মর্মগ্রহণ করতে উৎসাহিত করতে হবে; কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত বিষয়ের পাঠনের সময়ে ছাত্রদের সহযোগিতার অভাব হ'তে পারে। কোন কোন শিক্ষক এরূপ ক্ষেত্রে তাদের নিজের চেষ্টায় জ্ঞান আহরণ করতে সাহায্য না করে' সব কথাই বক্তৃতার আকারে বলে' দিতে চান। তাঁরা বলেন যে অপরিচিত বিষয়বস্তু ছাত্রদের কাছ থেকে আদায় করা অসম্ভব।

অসম্ভব কিছুই নয়, এরূপ বিষয়ের পড়াবার পদ্ধতি কেবল ভিন্ন। পাঠক্রম সাধারণত তিন প্রকারের হ'তে পারে। প্রথম, যে বিষয়ে ছাত্রেরা নিজেরা জানে, কেবল শিক্ষকের সাহায্যে পূর্বজ্ঞান সজ্জিত ও মার্জিত করে'

নিতে হবে, তার পাঠ। উদাহরণস্বরূপ "বিমানপোতের" কথা বলা যেতে পারে। ছাত্রদের মধ্যে বিমানপোত দেখেনি বা বিমানযুদ্ধের কাহিনী শোনেনি এমন কাউকে সম্ভবত দেখতে পাওয়া যায়না, শিক্ষক তাদের অভিজ্ঞতার ওপর কিছু নূতন জ্ঞান দান করলে তারা সম্পূর্ণ বিষয়টি বুঝে আলোচনা করতে পারবে। দানশীলতা, পরিচ্ছন্নতা, মাতৃস্নেহ প্রভৃতি সাধারণ গুণ এবং খেলাধুলার কথা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

দ্বিতীয়, অনুভবের দ্বারা যে-সব বিষয় হৃদয়ংগম করা যায় তার পাঠ, যেমন কবিতা বা গল্প। এরূপ ক্ষেত্রে ছাত্রের মনে বিষয়বস্তু আপনি রেখাপাত করে, সেই প্রভাবকে উজ্জ্বল করে' চেতনার দ্বারে পৌঁছে দেওয়া শিক্ষকের কাজ। সুনির্বাচিত প্রশ্ন চেতনাকে জাগ্রত করতে সাহায্য করে। কবিতার আদর্শপাঠ সুন্দর হ'লে তার সহায়তায় অনুভব বহুদূর অগ্রসর হয়।

তৃতীয়, জ্ঞানবিজ্ঞানবিষয়ক বা ব্যাকরণের পাঠ। এই শ্রেণীর পাঠে ছাত্রদের সহযোগিতালাভ কঠিনতম বলে' গণ্য হয়ে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে তাদের মস্তিষ্কের চালনা করাতে হয়। উদাহরণস্বরূপ জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা, যেমন গ্রহনক্ষত্রের কথা, ম্যালেরিয়া ও তার চিকিৎসার ইতিহাস, শরীরতত্ত্ব এবং স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় তথ্যসমূহ, নূতন নূতন আবিষ্কারের কাহিনী; চার্ট, ছবি, মডেল, নমুনা, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা প্রভৃতির সাহায্যে এত চিত্তাকর্ষক ও উজ্জ্বলভাবে ছাত্রদের সামনে তুলে ধরা যায় যাতে তারা নিজেরাই বিষয়ের মূল কথাগুলি বুঝে নিতে পারে। অবশ্য সাহিত্যের শিক্ষককে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে সাধারণজ্ঞানের পাঠে বাংলা পড়ানোর সাহিত্যিক উদ্দেশ্য দৃষ্টিবহির্ভূত না হয়। সাহিত্যিক ভাব ও উদ্ধৃতির দ্বারা তিনি পরিবেশ বজায় রাখবেন।

ব্যাকরণের পাঠে সামান্য পার্থক্য থাকলেও মোটামুটিভাবে বৈজ্ঞানিক

পথ অনুসরণ করা যায়। ব্যাকরণসম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদে যে-ভাবে ছাত্রদের ধীরে ধীরে ব্যাকরণের সংগে পরিচিত করার পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে তাতে ব্যাকরণশিক্ষার প্রত্যেকটি স্তরে তার পূর্বস্তরের অভিজ্ঞতাটুকু পূর্বজ্ঞানরূপে পাওয়া যায়; সেই ভিত্তিতে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের পথ অনুসরণ করে' আরোহপদ্ধতির দ্বারা শিক্ষা দেওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ 'বিশেষ্যের' পাঠক্রম নির্দেশ করা যায়। প্রথমাবস্থায় শিশু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষকের সামান্য সাহায্যেই আবিষ্কার করে যে, যে-সমস্ত শব্দ সে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে সেগুলি নানা শ্রেণীতে বিভাজ্য। তারপর, সেই শ্রেণীসমূহের মধ্যে একটি যে বস্তু, ভাব বা ব্যক্তির 'নাম' বোঝায় এবং এবং তাকে বিশেষ্য বলে' উল্লেখ করা হয়ে থাকে, একথা শিখে নেওয়া দুষ্কর হবে না। 'বিশেষ্য' এই শব্দটা যখন সে শিখবে তখন বিশেষ্যের সমস্ত বিবরণ পূর্বজ্ঞানরূপে তার সাহায্য করবে, নামটি মাত্র নোতুন। বিশেষ্যের শ্রেণিবিভাগশিক্ষাও ঠিক যে-ভাবে শব্দসমূহের শ্রেণিবিভাগ শেখান হয়, সেইভাবে হবে। এমন কি ব্যাকরণের অধিকাংশ নামেরই অর্থ থাকার দরুণ সেগুলি পর্যন্ত ছাত্রকে অন্ধভাবে মুখস্থ করতে হবেনা। এই পদ্ধতির ব্যবহার যদি বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত চলে তবে শিক্ষককে ছাত্রদের সহযোগিতার অভাবের জন্য কষ্টবোধ করতে হবে না।

এবার আরোহপদ্ধতিতে 'সমাস' শেখানর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরা যাক, সপ্তম শ্রেণীতে 'বহুব্রীহি সমাস' পড়ান হচ্ছে। ভূমিকায় ছাত্রদের সমাসসম্বন্ধীয় জ্ঞান পরীক্ষা করে' শিক্ষক বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ দিলেন। সুনিপুণভাবে নির্বাচিত উদাহরণগুলি বোর্ডের বাঁ দিকে স্তম্ভাকারে লিখে দিলেন। হয়ত কতকগুলি ছবির (বীণাপাণি, পীতাম্বর ইঃ) সাহায্যে অর্থের ধারণা স্পষ্টতর করা হ'ল। ব্যাসবাক্য করার আগে সমস্ত পদের উদাহরণ দেখেই ছাত্রেরা বহুব্রীহি সমাসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারবে।

বহুব্রীহি সমাস অন্যপদার্থপ্রধান, বিশেষ্যে বিশেষ্যে এবং বিশেষণে বিশেষ্যে এই সমাস হয় এবং কোন পদ পূর্বে ও কোন পদ পরে বসে তা তারা বলতে পারবে। এই স্তরে মূল সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম মুখে মুখে আলোচনা করে' আলোচনাজাত সূত্রগুলি অপর এক বোর্ডে বা ওই বোর্ডের এক চিহ্নিত অংশে লেখা হবে। স্থানাভাবে শিক্ষক আগে থেকে বড় করে' লিখে এনে যথাযথকালে একে একে টাঙিয়ে দেবেন। তারপরে প্রথম বোর্ডের দ্বিতীয় স্তম্ভে ব্যাসবাক্যগুলি করা হবে, প্রত্যেক প্রকারের প্রথমটির পর অন্যগুলির ব্যাসবাক্য ছাত্রেরা নিজেরা করতে পারবে। ব্যাসবাক্য দেখে বহুব্রীহিসম্বন্ধে জ্ঞান আরো বিশিষ্ট ও বিধিবদ্ধ হবে এবং সমানাধিকরণ, ব্যধিকরণ, ব্যতিহার, অলুক প্রভৃতি শব্দের অর্থবোধ হবে। শেষে বোর্ড মুছে দিয়ে পুনরালোচনা ও প্রয়োগ। এই প্রকারের পাঠে বোর্ডের কাজের পরিকল্পনায় চয়নৈপুণ্য চাই, অর্থাৎ যখন প্রথম স্তম্ভে উদাহরণগুলি তোলা হবে তখন থেকে শিক্ষক বহুব্রীহির প্রকারভেদ অনুযায়ী একেক প্রকারের উদাহরণ পরপর সজ্জিত করবেন। এতে জ্ঞান বিধিবদ্ধ হওয়া সহজ হয় ও বারবার বোর্ড মুছতে হয় না।

উপস্থাপনের পর পুনরালোচনা। এরদ্বারা ছাত্র তার পঠিত বিষয়ের নূতন জ্ঞানসমূহ গুছিয়ে নেবার সুযোগ পায়, দ্বিতীয়বার আলোচনায় বিষয়টি তার মনে স্পষ্টতর হয় এবং প্রথমবারে যদি কোন বিশেষত্ব বা সৌন্দর্য তার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে থাকে দ্বিতীয়বারে সেগুলি লক্ষিত হয়। সাধারণত উপস্থাপনের সময়ে পাঠ্যবিষয়টি যে-ভাবে আলোচিত হয় পুনরালোচনায় তদপেক্ষা ভিন্ন পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে। এতে বিষয়টি একঘেয়ে লাগতে পারে না এবং দুইবার দুইপ্রকারের আলোচনায় ধারণা উজ্জ্বলতর হয়। যেমন, কোন গল্প বা কবিতার উপস্থাপনের সময়ে যদি

কাহিনীর আলোচনা প্রধান হয়ে থাকে তবে পুনরালোচনার সময়ে ভাষার বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় অথবা ঘটনা বা চরিত্রের আলোচনা করা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'বৈরাগ্য' কবিতা নবম শ্রেণীতে পড়িয়ে পুনরালোচনায় ভারতের আদর্শের সম্বন্ধে আলোচনা করে' গৃহস্থাশ্রমের আবশ্যিকতা ও গৃহিযোগীর (গৃহীরে শিখালে তুমি যোগযুক্তচিতে'—ইঃ) আদর্শ ফুটিয়ে তোলা যায়। তাছাড়া পুনরালোচনায় অন্যান্য কবিতার সংগে তুলনা এবং অন্যান্য বিষয়ের সংগে অনুবন্ধ সার্থক হয়।

পাঠক্রমের সর্বশেষ অংশ প্রয়োগ বা অধীত বিষয়ের পরীক্ষা। বিষয়টি ছাত্রেরা বুঝেছে কিনা এই অংশে শিক্ষক তা জানতে পারেন এবং ছাত্রদের মনে সংশয় বা ভুল ধারণা থাকলে তার নিরসন করা যেতে পারে। প্রয়োগের কাজ দেওয়ার বিষয়ে শিক্ষকের খুব সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। রচনা ও প্রবন্ধের প্রসংগে বলা হয়েছে যে যে-কোন বিষয়ের লেখার কাজ দেবার পূর্বে তদ্বিষয়ের দীর্ঘ ও পুংখানুপুংখ আলোচনার প্রয়োজন। সেই সূত্র অনুসরণ করে' এই সত্যে উপনীত হওয়া যায় যে সাধারণ একটি সম্পূর্ণ পাঠের পর আলোচনা করে' লিখতে দেওয়া একঘণ্টা সময়ের মধ্যে কুলিয়ে ওঠা কঠিন—প্রায় অসম্ভব। এইকথা স্মরণ করে' শিক্ষকেরা পাঠের শেষে যত কম লিখতে দেন তত ভাল এবং লেখার বিষয়টি যেন এমন হয় যে পাঠ-ক্রমের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছে তার ওপর নির্ভর করে' লেখান যায়। যেমন, হয়ত একটি গল্প পড়িয়ে প্রয়োগের সময়ে তার প্রধান চরিত্রগুলির নাম লিখতে বলা হ'ল, অথবা রবীন্দ্রনাথের "গুপ্তধন" পড়িয়ে গুপ্তধনের অনুসন্ধানকারীদের পরস্পরের সম্পর্ক নির্ণয় করতে বলা হ'ল।

লেখা ভিন্ন অন্যপ্রকারে পাঠ্যবিষয়ের প্রয়োগ চলে। শিক্ষকের যত্ন, বুদ্ধি ও মৌলিকতার ওপর এর সফলতা নির্ভর করে। দু'একটি উৎকৃষ্ট প্রয়োগের উদাহরণ নিচে দেওয়া হ'ল।

তৃতীয়শ্রেণীতে রবীন্দ্রনাথের "বীরপুরুষ" চিত্রের সাহায্যে পড়ান হ'ল। "শিশুভারতী"তে যেরূপ প্রত্যেক স্তবকে একেকটি ছবি দেওয়া আছে সেই আদর্শে শিক্ষয়িত্রী বড় বড় ছবি এঁকে এনেছিলেন। প্রয়োগের বিষয় ছিল কবিতা থেকে অংশ উদ্ধৃত করে' ছবিগুলির নামকরণ। এতে পারম্পর্যানুসারে ছবিগুলির নাম করতে গিয়ে গল্পটির পুনরালোচনা হ'ল, উপরন্তু কবিতা থেকে ছবির উপযোগী উদ্ধৃতি তুলে দিয়ে ছাত্রেরা সাহিত্যবোধের পরিচয় দিলে।

চতুর্থশ্রেণীতে "ভাতের জন্মকথার" ওপর নির্ভর করে' চিত্রের সাহায্যে ধানের চাষ ও চালের উৎপত্তিসম্বন্ধে পড়ান হয়েছিল। প্রয়োগের সময়ে ছাত্রদের চিত্রগুলিকে পারম্পর্যানুসারে সাজিয়ে দিতে বলা হ'ল। ধানচাষের সমগ্র কাহিনীটি তারা অনুসরণ করতে পেরেছে কিনা তার প্রমাণ হ'ল। (বস্তুত "ভাতের জন্মকথার" ছবি ও ছড়ার ব্যবহারের সাহিত্যিক পরিবেশ উপস্থাপনকে সাধারণজ্ঞানের পাঠে পরিণত হওয়ার থেকে উদ্ধার করেছে।)

অষ্টম শ্রেণীতে গ্রাম্য জীবনের বর্ণনামূলক কবিতা পড়িয়ে প্রয়োগের সময়ে গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনের আপেক্ষিক উৎকর্ষাপকর্ষের আলোচনা করা হয়েছিল। এতে গ্রামের বর্ণনার সংগে ছাত্রদের উভয়দেশদর্শন দ্বারা বিচারক্ষমতা বর্ধিত হ'ল।

নবম শ্রেণীতে দীনেশচন্দ্র সেনের "দশরথ" পড়িয়ে প্রয়োগে রামের বনবাস সম্বন্ধে কার কতটা দায়িত্ব সেই নিয়ে আলোচনা হ'ল। এতে বিষয়বস্তুর পুনরালোচনা ও পক্ষপাতহীন মনোভাবের গঠন দুইই হ'ল, কেননা, দশরথের দায়িত্বটুকুর বহু অংশীদার রয়েছে বলে' এই আলোচনায় কেবল দুটি দিক দর্শন করা সম্ভব হয়নি।

দশম শ্রেণীতে ওয়াজেদ আলির "ভারতবর্ষ" পড়িয়ে প্রয়োগের সময়ে

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা হ'ল। উক্ত প্রবন্ধে ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্যের চিত্র আছে মাত্র, পাশ্চাত্ত্যের সংগে তুলনায় সেই চিত্র পূর্ণতা লাভ করল এবং ছাত্রদের মনে বিশ্বমানবতার ভাবের উদ্বোধনের সহায়তা হ'ল।

পুনরালোচনা দীর্ঘ বা দুই অংশে বিভাজ্য হ'লে পৃথক প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। উপরিউক্ত প্রয়োগের উদাহরণগুলির অধিকাংশ এই শ্রেণীভুক্ত। তর্ক ও আলোচনার জন্য প্রথমে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সমস্ত বিষয়টি তৈরি করে' নিয়ে তারপর কাজ করালে পুনরালোচনা ও প্রয়োগ একত্রে হয়। অনেকে এই সংযুক্ত প্রক্রিয়াকে "অভিযোজন" আখ্যা দেন।

এ ছাড়া বস্তুমূলক পরীক্ষণের (Objective Tests) ভিত্তিতেও প্রয়োগের কাজ দেওয়া যায়। এইরূপ কাজ ব্যাকরণের পাঠের পক্ষে উপযোগী।

বোর্ডের কাজ পাঠক্রমের অন্তর্গত। ছবি, চার্ট ইত্যাদি থাকলেও শিক্ষক যা পড়াবেন তার টীকা বোর্ডে করলে স্পষ্ট ও উজ্জ্বলভাবে ছাত্রের সামনে প্রতিভাত হবে। বোর্ডের কাজ সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা হয়—সংক্ষিপ্তসার ও শব্দার্থ। ব্যাকরণের পাঠে বোর্ডের কাজের দুই অংশ হয়—উদাহরণ এবং সূত্র ও সংজ্ঞা। এইজন্য ক্লাসে দুটো বোর্ড থাকা ভাল। শিক্ষক কিন্তু মনে রাখবেন সাহিত্যপাঠের সময়ে শব্দার্থ ও ব্যাকরণের আলোচনা যেমন যতদূর সম্ভব কম করা হবে তেমনি বোর্ডেও এই বিষয়সম্পর্কিত কাজ যতদূর বর্জন করা হয় তত ভাল। আর সংক্ষিপ্ত-সার যেন সারাংশের মত না হয়ে চুম্বকের মত হয়। উচ্চশ্রেণীতে এই সংকেত পূর্ণ বাক্যরূপ না নিলেও চলবে। সুন্দর বোর্ডের কাজের একটি উদাহরণ দিই, চতুর্থশ্রেণীতে শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের "সুখ-দুঃখ" পড়াবার

সময়ে বোর্ডে "সুখ" ও "দুঃখ" এই দুই স্তম্ভ করে' একদিকে সুখের ও একদিকে দুঃখের লক্ষণ ও কারণ সংকেতদ্বারা দেখিয়েছিলেন।

বোর্ডের কাজ উপস্থাপনের সংগে চলে। এই সময়ে যেমন যেমন যে যে বিষয়ের উত্থাপন ও আলোচনা হবে শিক্ষক তখন তখন তার সংকেত বোর্ডে তুলে দেবেন।

বোর্ডে ছবি আঁকার ক্ষমতা শিক্ষকের বিশেষ সহায়। বিশেষ করে' নিচের শ্রেণীতে ছড়ার সংগে ছবি আঁকা চমৎকার হয়। যেমন, 'একানোড়ে' আর তার তালগাছ, 'হট্টিমাটিমটিম' আর তার ডিম, শিক্ষক যদি রঙিন চক দিয়ে বোর্ডে এঁকে দেন তবে তা সংগে আনা ছবি দেখানর চেয়ে চিত্তাকর্ষক হয়। রবীন্দ্রনাথের "নৌকাযাত্রা" ("মধুমাঝির ওইযে নৌকাখানি") পড়াতে প্রথমে নৌকা, তারপর ঘাট, তারপর তার যাত্রা, পরে পরে এঁকে দেখান যায়। তবে ওপরের ক্লাসের ছাত্রদের ছবির উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করবার ক্ষমতা থাকার ফলে শিক্ষকের চিত্রাংকনক্ষমতা উঁচুদরের না হ'লে সে-কাজ নিরাপদ নয়। উচ্চশ্রেণীতে শিক্ষক তৎপরতার সংগে নক্সা, মানচিত্রাদি আঁকতে পারলে ছাত্রের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবেন। অবশ্য সাহিত্যের চেয়ে বিজ্ঞান, ভূগোল, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, প্রকৃতিপরিচয় প্রভৃতি পাঠে এই গুণের বেশি প্রয়োজন হয়।

বোর্ডের কাজ ভিন্ন পড়াবার অন্যান্য উপকরণ বা সরঞ্জামেরও (apparatus) ব্যবহার হয়। বিষয়বস্তুকে প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য করবার জন্য যে-সব চিত্র, মানচিত্র, নক্সা, মডেল, নমুনা, পরীক্ষা (experiment) প্রভৃতির যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় সেগুলি এই শ্রেণিভুক্ত। এই উপকরণের উপযোগিতা থাকা দরকার। যেমন, যে ক্লাসের ছাত্রেরা ভূগোলে দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত অগ্রসর হয়নি তাদের কাছে দক্ষিণ আমেরিকার মানচিত্রে ম্যালেরিয়ার জন্মস্থান নর্দেশ অনুপযোগী; অথবা, ঘোড়ার বিষয়ে প্রবন্ধ

লেখাতে গিয়ে শ্রেণিকক্ষে একটি ঘোড়া এনে উপস্থিত করা হাস্যকর। ছবি যদি উৎকৃষ্ট না হয় তবে ওপরের ক্লাসে না দেখান ভাল। নিচের ক্লাসে ছড়া, গল্প, যাই পড়ান হ'ক না কেন, ছবি দেখান চাই।

উপকরণ যেমন প্রয়োজনীয়, উপকরণের বাহুল্য তেমনি পাঠ্যবিষয় থেকে ছাত্রের মন বিক্ষিপ্ত করে; বিশেষত বাংলার শিক্ষককে দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে উপকরণবাহুল্যে সাহিত্যানুভব চাপা পড়ে' না যায়।

সম-উক্তি সংকলন পাঠক্রমের আরেক অংগ। সম উক্তিতে সাহিত্যিক অনুসংগ দ্বারা ছাত্রের মনে পাঠ্যবিষয় সরস ও উজ্জ্বল হয়, সাহিত্যজ্ঞান ও সাহিত্যানুভবে সহায়তা করে। তবে সম-উক্তিতে যেন সত্যকার সাদৃশ্য থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে এবং অতিরিক্ত সংখ্যক সম-উক্তি না দেওয়াই ভাল, কেননা, তাতে ছাত্রদের মন বিভ্রান্ত ও মূল বিষয় থেকে বিক্ষিপ্ত হ'তে পারে। ছাত্রদের দ্বারা স্বয়ংসঞ্চয়নের সংগে সম-উক্তি-সংকলন উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক অভ্যাস।

প্রশ্ন করা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার অপরিহার্য অংগ। শিক্ষক যদি বক্তৃতার আকারে পাঠ্যবস্তুর ব্যাখ্যা করেন তবে ছাত্রদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। বালস্বভাব এই যে দেহমন দিয়ে সে সর্বদা এগিয়ে গিয়ে আলোচ্য বিষয়টিকে আক্রমণ করতে চায়; ধীরভাবে বসে' ভাবগ্রহণ করবার জন্য সে তৈরি হয়নি। কাজেই পাঠক্রম এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে ছাত্র নিজের উৎসাহ ও চেষ্টার দ্বারা বিষয়বস্তুকে আয়ত্ত করতে পারে। তাছাড়া নূতন পাঠ ছাত্রের পূর্বজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হয় এবং তার মনে যা অসজ্জিত তাকে সজ্জিত করে', যা অবচেতনে বিরাজিত তাকে চেতনায় এনে শিক্ষা দেওয়াই প্রকৃত পাঠ। এরজন্য পাঠের প্রত্যেক স্তরে প্রশ্নের প্রয়োজন। ভূমিকায় সন্ধানী প্রশ্নের দ্বারা শিক্ষক ছাত্রের পূর্বজ্ঞানের পরিমাপ করবেন এবং ওই জ্ঞানের কতটা চেতনায়, কতটা অবচেতনে,

কতটা সজ্জিত, কতটা বিক্ষিপ্ত, তা অনুমান করে', সেগুলিকে জাগ্রত ও শ্রেণিবদ্ধ করে', ছাত্রদের নূতন পাঠের গ্রহণোন্মুখ করবেন। তারপর উপস্থাপনে, পাঠ্যবস্তুর বিষয়ে প্রশ্ন করে', পাঠবোধের সীমা নির্ণয় করে', পরিপূর্ণভাবে বোঝার দিকে অগ্রসর হবেন এবং বিচারমূলক প্রশ্ন দ্বারা যুক্তি ও অনুমানের প্রয়োগে বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ করে' আত্মসাৎ করতে সাহায্য করবেন। প্রয়োগ ও পুনরালোচনার প্রশ্নে অর্জিত জ্ঞান ও অনুভবের পরিমার্জন ও পরীক্ষণ হবে।

প্রশ্ন করে' উত্তর আদায় করা সূক্ষ্ম কাজ। অনেক সময়ে ছাত্রেরা সহজ প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারে না, তখন উত্তরটি না বলে' দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্ন দ্বারা উত্তর আদায়ের চেষ্টা করা শিক্ষকের কর্তব্য। হয়ত ছাত্র প্রশ্নটি বুঝতে পারেনি, সে-ক্ষেত্রে প্রশ্নের আকারের পরিবর্তন দরকার। উদাহরণস্বরূপ,—"গরু আমাদের কি কি উপকার করে?"—এই প্রশ্নের উত্তর যদি নিম্নশ্রেণীর ছাত্রেরা দিতে না পারে, তবে—"গরুর কোন কোন জিনিষ আমাদের কাজে লাগে?"—জিজ্ঞাসা করা যায় এবং তা-ও বলতে না পারলে গরুর প্রত্যেক অংশ নিয়ে পৃথক প্রশ্ন করতে হবে। ছাত্র প্রশ্নের উত্তর কিছুতেই দিতে না পারলে অনেক সময়ে বইয়ের যে অংশে সেটি নিহিত আছে সেই অংশটি আর একবার পড়ালে উত্তর পাওয়া যেতে পারে।

উত্তরপ্রাপ্তির সুবিধার জন্য অনেক শিক্ষক এমন প্রশ্ন করেন যার মধ্যে উত্তরটি নিহিত থাকে (leading or suggestive questions); এরূপ প্রশ্নের একটি লক্ষণ যে "হ্যাঁ" বা "না" বলে' এর উত্তর দেওয়া যায়, যথা—"গরু আমাদের খুব উপকার করে, না?" এর উত্তরে ছাত্রেরা নিশ্চয়ই "হ্যাঁ" বলবে। উত্তর সহজলভ্য হ'লেও এরূপ প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নই নয়।

প্রশ্নের প্রকৃতি যাতে ব্যাপক (general) বা ভাষা অস্পষ্ট না হয় সেদিকে শিক্ষককে দৃষ্টি রাখতে হবে। যেমন, কোন কবিতার একটি স্তবক পড়িয়ে "এখানে কবি কি বলতে চেয়েছেন ?" জিজ্ঞাসা করা অনুচিত, কারণ ছাত্র ওই অংশের ভাষান্তর (para-phrase) করতে উদ্যত হয়ে সাহিত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়। অপরপক্ষে—"এই কবিতাটি কেমন লাগল ?" বা "এর কোন্ অংশ তোমাদের সবচেয়ে ভাল লাগে ?"—জাতীয় প্রশ্ন ছাত্রের সদ্যোদ্বুদ্ধ সাহিত্যবোধের পক্ষে অতিরিক্ত অস্পষ্ট।

যেমন সাধারণ ভাবমূলক প্রশ্নদ্বারা প্রকৃত সাহিত্যবোধ হয়না, তেমনি শাব্দিক অর্থবোধের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রশ্ন করাও রসবোধের পরিপন্থী, যথা, দশম শ্রেণীতে রবীন্দ্রনাথের "বৈরাগ্য" কবিতা পড়াতে "এই ছত্রের অর্থ কি ?"—"এই অংশে স্ত্রী-অর্থে কোন্ শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে ?"—কোন্ শব্দে ভগবানের নাম বোঝাচ্ছে ?" প্রভৃতি প্রশ্ন অবাঞ্ছনীয়।

বাস্তব ও বিশিষ্ট অর্থবোধের ওপর প্রশ্নকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যথা, পঞ্চম শ্রেণীতে "বীরপুরুষ" পড়িয়ে প্রথম স্তবকের বিশ্লেষণের সময়ে জিজ্ঞাসা করা যায়—"আমি কে ?" "সে কোথায় যাচ্ছে ?"—"কিসে চড়ে' যাচ্ছে ?"—"কোথা দিয়ে যাচ্ছে ?" ইত্যাদি।

ক্লাসের প্রত্যেক ছাত্র যাতে প্রশ্নের উত্তর দেবার সমান সুযোগ পায় (distribution of questions) সে-দিকে শিক্ষককে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে হবে। প্রত্যেক শ্রেণীতে এমন দুয়েকটি বুদ্ধিমান ছাত্র দেখা যায় যারা সব প্রশ্নের উত্তর সর্বাগ্রে ধরতে পারে। শিক্ষক যদি সাধারণভাবে প্রশ্ন করেন তবে বুদ্ধিমানেরাই উপকৃত হয় এবং অপরেরা পাঠানুসরণে অসুবিধা বোধ করে। এইজন্য 'শিক্ষক প্রত্যেক প্রশ্নের পর নাম করে' উত্তরদাতা নির্দিষ্ট করে' দেবেন। বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিহীন ছাত্রেরা যাতে প্রশ্ন ও পাঠের সমান অংশ পায় তার জন্য এই ব্যবস্থা। প্রশ্ন করার

পদ্ধতি এই যে শিক্ষক প্রথমে প্রশ্নটি সাধারণ ভাবে শ্রেণীর সম্মুখে স্থাপিত করবেন ও অব্যবহিত পরে বালকের নাম করে' দেবেন। এতে প্রশ্ন-করা ও বালকের নাম-ডাকার মধ্যবর্তী সময়ে সকলকে উত্তরটা ভেবে রাখতে হয়, কারণ শিক্ষক কার নাম ডাকবেন তা তারা জানেনা; এতে প্রশ্নের উত্তর একজনকে দিতে হ'লেও সকলকে চিন্তা করতে হয়। ঠিক এই কারণেই শিক্ষক ক্লাসের ছেলেদের বসা বা রোল-নম্বর অনুসারে প্রশ্ন করবেন না, এলোমেলোভাবে জিজ্ঞাসা করবেন।

শিক্ষক কেবল সকলকে সমভাবে প্রশ্ন বণ্টন করবেন না, প্রত্যেককে তার বুদ্ধির উপযোগী প্রশ্ন দেবেন; কঠিনতম প্রশ্নগুলি বুদ্ধিমান ছেলেদের দেবেন এবং অল্পবুদ্ধিদের জন্য সহজ প্রশ্নগুলি রাখবেন। অনুপযোগী প্রশ্নে সকলেরই ক্ষতি হয়। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি খাটাবার যথেষ্ট সুযোগ না পাওয়া আর বুদ্ধিহীনের অতিরিক্ত কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে ব্যর্থমনোরথ হওয়া, দুইই হানিকর।

যেমন উপকরণপ্রসংগে, তেমনি প্রশ্নব্যাপারেও যাতে প্রশ্নবাহুল্যে পাঠের সাহিত্যিকতার হানি না ঘটে সে বিষয়ে শিক্ষককে সচেতন থাকতে হবে। প্রশ্নের সংগে শিক্ষকের ভাষণের সামঞ্জস্যময় সংমিশ্রণ না হ'লে, পাঠটি হয় প্রশ্নমালায় পরিণত হয়ে নীরস হয়ে পড়বে, নয়ত শিক্ষকের বক্তৃতার আধিক্যে শ্রেণীকে নিশ্চেষ্ট ও আগ্রহহীন করে' ফেলবে; সুশিক্ষককে দুয়ের অন্তর্বর্তী ক্ষুরধারপথে অগ্রসর হ'তে হবে।

পাঠক্রমে ছাত্রদের বয়স, পূর্বজ্ঞান এবং পাঠের উদ্দেশ্যের উল্লেখ করার নিয়ম আছে। বয়সের নির্দেশ পাঠের আদর্শনির্ণয়ের জন্য। একই বিষয় বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণী থেকে আরম্ভ করে' বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট থাকতে পারে; কাজেই ছাত্রদের বয়সের তারতম্যানুযায়ী পাঠনরীতির ভিন্নতার দ্বারা বিষয়বস্তুর উপযোগিতা সম্পাদন করতে হয়।

নূতন পাঠ পূর্বজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় বলে' পাঠটীকার প্রথমে পূর্বজ্ঞানের উল্লেখ প্রয়োজনীয়। ছত্রেদের পাঠ্যবিষয়সম্পৃক্ত যা কিছু জ্ঞান আছে তৎসমুদয়ের উল্লেখ এই অংশে করতে হবেনা, কেবল ভূমিকা ও উপস্থাপনে যেটুকু জ্ঞান ব্যবহৃত হয় তার কথা লিখতে হয়।

পাঠের উদ্দেশ্য নানাপ্রকার হ'তে পারে। একটি কবিতা হয়ত নিম্নশ্রেণীতে অনুভবদ্বারা পড়ালে যথেষ্ট, আবার উচ্চশ্রেণীতে সেটিকে সাহিত্য ও কবিজীবনের ধারার সংগে সংশ্লিষ্ট করে' দেখাতে না পারলে পাঠের উদ্দেশ্য সফল হবে না। তাছাড়া যে কবিতা, প্রবন্ধ বা গল্প পাঠ্য থাকবে তার বিশেষ গুণাগুণের অনুসারে উদ্দেশ্যের উপযোগিতা নির্ণীত হয়। যেমন, "ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল" নামক প্রবন্ধপাঠের উদ্দেশ্য 'সাহিত্যানুরাগবর্ধন' বা হাস্যরসাত্মক কবিতা পড়ানর উদ্দেশ্য 'নৈতিক উন্নতি' হওয়া উচিত নয়।

আজকাল নূতন নূতন শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবনে উপরে বর্ণিত ক্রমের পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু আমাদের দেশে, বিশেষত বাংলাশিক্ষায় সেগুলির বহুল প্রচলন হয়নি।

যে-সব বিদ্যালয়ে খেলা ও কাজের ভিত্তিতে শিক্ষাদানের পদ্ধতি প্রচলিত আছে সেখানে পরিকল্পনাকে (projects) কাজে রূপায়িত করার প্রসংগে অন্যান্য বিষয়ের সংগে ভাষার ব্যাবহারিক শিক্ষা হয়ে থাকে। যেমন ছাত্রেরা হয়ত একটি দোকান খুলেছে; দোকানের নাম, জিনিষের লেবেল, বিজ্ঞাপনাদি পাঠ করে' নিজ হাতে সুন্দর করে' লিখে, খাতায় জমাখরচের হিসাব করে' এবং ক্রেতাবিক্রেতার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ছাত্রেরা বাংলাভাষা বলা, পড়া ও লেখার ব্যাবহারিক জ্ঞান লাভ করে। এই ধরনের কাজ একদিনে সম্পূর্ণ হয় না, একে বিদ্যালয়ের স্থায়ী অংগে পরিণত না করলে এর উদ্দেশ্য সফল হয় না। সম্পূর্ণ কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়

না হ'লেও অন্তত প্রত্যহ বা সপ্তাহে কয়দিন এর জন্য পৃথক ঘণ্টা নির্দিষ্ট করে' দেওয়া চাই। উদাহরণস্বরূপ, একটি দোকান যদি বিদ্যালয়ে স্থায়িভাবে পরিচালিত হয় তবে লেখাপড়ার সুবিধা ভিন্ন অন্যান্য উদ্দেশ্যও সাধিত হয়। সাধারণত ছেলেরা খাতা-পেন্সিল-বই থেকে আরম্ভ করে' চকোলেট-লজঞ্চুস-চীনেবাদাম প্রভৃতি যে সব জিনিষ বাইরে কিনতে অভ্যস্ত, বিদ্যালয়ের ভেতরেই সেগুলি যদি পাবার ব্যবস্থা হয়, তাতে তাদের দায়িত্বজ্ঞান বাড়ে এবং তারা কি ভাবে টাকা-পয়সা খরচ করছে না করছে সেদিকে শিক্ষকেরা দৃষ্টি রাখতে পারেন।

এক বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে স্থানীয় কলেরা-মহামারীর সময়ে বীজাণুমুক্ত টিফিনের ব্যবস্থা করার জন্য ছেলেদের দ্বারা একটি ছোট দোকান প্রতিষ্ঠিত করান হয়। ক্রমে ওই দোকান টিফিন ভিন্ন অন্যান্য নানা জিনিযের কারবার করে' থাকে এবং লাভের অংশে ছেলেদের দিয়ে পাশাপাশি একটি ব্যাংকও খোলা হয়। একটি ছোট ঘরে বড়দের ব্যাংকের অনুরূপ আসবাব উপকরণাদি দিয়ে ব্যাংক বসে এবং ব্যাংকপরিচালনের নিয়মানুযায়ী ছেলেরাই তার পরিচালন করে। শিল্পকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে বই-বাঁধাই, খাতা তৈরি, ছাপাখানা প্রভৃতি শিল্প এবং বাগানের কাজ, দোকান ও ব্যাংকের সংগে সহযোগিতায় পরিচালিত হতে পারে। বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থায় প্রধানত এই পদ্ধতির সাহায্যেই শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।

এইভাবে ডাকঘর ও রেলষ্টেশনের খেলা, বাগান করা, সুতো-কাটা, শিল্পকর্ম, ক্লাসের পুস্তকসংগ্রহের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি নানা কাজে আনন্দের সংগে, কর্মশীলতার মধ্য দিয়ে বিবিধ প্রকারের নৈপুণ্য ও মাতৃভাষার ব্যবহারশিক্ষা হয়। এতে বিদ্যালয়ের অধীত বিষয়ের পরস্পরের সংগে এবং সকলের মাতৃভাষার সংগে অনুবন্ধ স্থাপিত হয় এবং ঘর, বাহির ও বিদ্যালয়ের একটি সামঞ্জস্যময় পরিপ্রেক্ষিত রচিত হয়।

ওপরের শ্রেণীর ছাত্রেরা বিদ্যালয়সভার গঠন, সাহিত্য, খেলাধুলা বা অভিনয়ের সমিতির অনুষ্ঠান, বিদ্যালয়ের পত্রিকার প্রকাশন, গ্রন্থাগারের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতিদ্বারা, আলোচনাসভা ও উৎসবাদির আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষ্যে এবং স্কাউট, এন-সি-সি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে, সমাজের সংগে সংযোগে এই শিক্ষার পূর্ণতা লাভ করে। তাছাড়া প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দিয়ে কোন দেশহিতকর কাজ করিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত। কাজ অর্থে চাঁদা তোলা বা একদিন স্বেচ্ছাসেবক হওয়া নয়; শিক্ষাবিস্তার, আতুরের সেবা প্রভৃতি কোন স্থায়ী গঠনমূলক কাজ।

যে-কোন পরিকল্পনায় সহযোগিভাবে অংশ গ্রহণের সময়ে যাতে শ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্র তার বুদ্ধি ও নৈপুণ্যের উপযোগী অংশ পায় সে দিকে শিক্ষক দৃষ্টি রাখবেন। যারা ভাল ছবি আঁকতে পারে তারা আঁকবে, যারা লিখতে পারে তারা লিখবে, সুবক্তা বক্তৃতা দেবে, বুদ্ধিমানেরা জ্ঞানসংগ্রহ ও সংকলনে আত্মনিয়োগ করবে, অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধি যাদের তারা কার্যিক দিকে অংশ গ্রহণ করবে।

পরিকল্পনামূলক শিক্ষা একদিকে যেমন ছাত্রদের ব্যাবহারিক শিক্ষা ও কর্মতৎপরতার সহায়ক তেমনি জ্ঞানানুসন্ধানেরও উদ্বোধক। ছাত্রের জ্ঞানস্পৃহা জাগ্রত হ'লে সে নূতন নূতন জ্ঞান অর্জনের জন্য উন্মুখ হয়। সেই আকাংক্ষা বিদ্যালয়ের ঘণ্টা হিসেবে ওজন করা পাঠের দ্বারা মেটে না। তাই ছাত্রদের বুদ্ধি ও প্রেরণা অনুযায়ী জ্ঞানলাভের সুযোগ দেওয়ার উপযোগী স্বাধীন পাঠপদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছে। আমেরিকার "ডাল্টন" পদ্ধতি এর রূপভেদ এবং অন্যান্য রূপেও এর ব্যবহার হয়। ছাত্রদের নিয়মিত ঘণ্টায় ঘণ্টায় শিক্ষা দেওয়া হয় না; বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের পরিবর্তে বিষয়কক্ষ, অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়ের উপকরণ ও পুস্তকাদিসমন্বিত ঘর থাকে এবং সেই ঘরে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকেরা শিক্ষায় সাহায্য করার জন্য অপেক্ষা

করেন। প্রত্যেক ছাত্র নিজ রুচি, নৈপুণ্য ও বুদ্ধির অনুসারে সপ্তাহ বা মাসের করণীয় পাঠ (assignment) চিহ্নিত করে' নেয় এবং স্বাধীন উপযাচনায় শিক্ষকদের সাহায্যে এবং পুস্তক ও উপকরণাদির ব্যবহারে শিক্ষা লাভ করে। এতে স্বচেষ্টায় জ্ঞানার্জন করে' ছাত্রেরা জ্ঞানের মূল্য বুঝতে শেখে ও তাদের দায়িত্বজ্ঞান জাগ্রত হয়। জ্ঞানের উপকরণ ও আধার তাদের সম্মুখে থাকাতে জ্ঞানপিপাসা বৃদ্ধি পায় এবং পাঠ্যপুস্তকের সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকার অথবা মুখস্থ করে' পরীক্ষা পাশ করার মনোবৃত্তি জন্মায় না।

এই পদ্ধতি সুপরিচালিত না হ'লে অতিমাত্রিক ব্যক্তিগত কাজের ফলে ছাত্রগণের সামাজিক বৃত্তির পরিণতি ব্যাহত হয়ে তারা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়তে পারে। এইজন্য দিনে অন্তত একবার একত্রে পাঠ গ্রহণ এবং সহযোগিতামূলক আলোচনা বা গবেষণার কাজের ব্যবস্থার দ্বারা এই দোষের নিবারণ করা হয়। সহযোগিতামূলক কর্মপদ্ধতি ও ব্যক্তি-তন্ত্র পাঠপদ্ধতির সামঞ্জস্যময় সংমিশ্রণই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ব্যবস্থা বলে' গৃহীত হয়ে থাকে।

নূতন নূতন পদ্ধতির উৎকর্ষ স্বীকৃত হ'লেও প্রচলিত পদ্ধতির বিদ্যালয়ে সহসা এগুলির প্রবর্তন সম্ভব নয়। এইজন্য ধীরে ধীরে পরিবর্তনের দ্বারা নূতন পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ বিষয়গুলি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। 'নার্সারি' 'মন্টিসরি' 'কিণ্ডারগার্টেনের' পৃথক ব্যবস্থা অনেক বিদ্যালয়েই আছে; তারপর শিল্পাগার, মিউজিয়ম প্রভৃতির সংযোজনদ্বারা ক্রমশ পরিপূর্ণ পুনর্গঠনের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়।

—শেষ—